নমামি

(গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের কথা-চিত্র)

শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

বিমলারঞ্জন প্রকাশন

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক—শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ -১৩৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৫৮

দাম আড়াই টাকা

প্রিন্টার—শ্রীনীরেশনাথ ভট্টাচার্য্য
মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

অগ্রজ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা,

আপনাকে কেন্দ্র করে রাজসাহীতে 'অনুশীলন' দলের যে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে, আমার স্বাদেশিকতার হাতে খড়ি সেখানেই হয়। ভারতের মুক্তিসমরের বহু নির্ভীক যোদ্ধার বহু আত্মোৎসর্গী মহাবীরের পুণ্যময় সাহচর্যের যে সৌভাগ্য আমি জীবনে পেয়েছি আপনার বৈপ্লবিক আগ্রহেই তার সূচনা ও উন্মেষ। আমাদের দুর্গম পথের যাত্রীদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের অনেকেই ঘরের টানে পথ ছেড়েছেন। কিন্তু আপনার পথ-চলা আজও শেষ হয়নি। তাই আমার ভক্তির অর্ঘ্য "নমামি" আপনার ক্লান্তিহীন চরণোদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। ইতি—

আপনার

স্নেহাকাঙ্ক্ষী অনুজ—

জিতেশ

এই লেখকের অপর গ্রন্থ

সর্বজন প্রশংসিত, অগ্নিযুগেব বহু গোপন তথ্য
সম্বলিত, সাহিত্য বস সমৃদ্ধ, বোমাঞ্চকব
বাস্তব ঘটনাব উপব পবিবেশিত
বৈপ্লবিক উপন্যাস

"বিপ্লবের তপস্যা"

দাম -দুই টাকা।

অমৃতবাজাব, আনন্দবাজাব, সত্যযুগ, যুগান্তব, নেশন, বর্ত্তমান,
গণবাজ প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

"নমামি" ও "বিপ্লবের তপস্যা"র প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীদ্বিজেন মৈত্র ৮।২ গোপ লেন কলিকাতা—১৪
২। গ্রন্থকার—পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ
৩। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী—পোঃ ঘোড়ামারা, জেলা রাজসাহী
৪। শ্রীস্বদেশ নাগ—৫১নং হেমেন্দ্র দাস বোড, ঢাকা
৫। শ্রীরণেন বায় চৌধুরী

কল্যাণী কেবিন—মুজঃফবপুব

এবং

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গেব প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

নিবেদন

প্রতিদিন সন্ধ্যাব পর আমার ছেলেমেয়েবা আমাকে ঘিবে বসে গল্প শুনতে চায। মহাভাবত, বামায়ণ আব ইতিহাসের যত বীরত্বেব কাহিনী, মহত্বেব কাহিনী আমি জানতেম ফুলিয়ে ফাঁপিযে সব বলেছি। কিন্তু আবো চাই—আবো চাই। তাই ওদেব দাবী মেটাতে সুরু কবেছিলাম অগ্নিযুগেব কাহিনী—গল্পচ্ছলে সাজিয়ে শুনিযেছি দিনেব পব দিন। এই থেকেই অগ্নিযুগেব ঘটনা ও ঘটনাবহুল চবিত্রগুলি নিযে গল্প লেখাব ইচ্ছা হয। তাব উপব দাদাব ক্রমাগত তাগিদে অগ্রসব হই।

আমি সাহিত্যিক নই। বোধ হয় কোন সাহিত্যিকেব হাতে এই সব মাল-মশলা পড়লে গল্পগুলি সুন্দব রূপ পেত যেমন পেয়েছে মনোজ বাবুব "ভুলি নাই" বইয়ে। তাঁব লেখনীতে অগ্নিযুগেব কাল্পনিক চবিত্রগুলি চমৎকার ফুটে উঠেছে। আমাব "নমামি"ব বেশীব ভাগই বাস্তব ঘটনা, অল্পটুকু কল্পনা—অর্থাৎ মুখ্যতঃ ইতিহাস, গৌণতঃ গল্প।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দেশেব চবম দুর্দিনে যে আপনভোলা তরুণেব দল স্বাধীনতাব স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল, নিঃশেষে নিজেকে বিলিযে দিয়ে সেই স্বপ্ন সার্থক কবতে চেয়েছিল, যাদেব অস্থি ও বক্ত দিয়ে স্বাধীনতাব সোপান নির্মিত হয়েছে তাদেব অনেকেই আজ অবজ্ঞায একপাশে পড়ে রয়েছে। অথচ কত দেবোপম শুভ্রতা,—কত ত্যাগ, কত প্রেম, কত অপূর্ব কর্মকুশলতা বয়েছে এঁদের চরিত্রে। অবহেলার এই অপচয়েব জন্য একদিন হয়তো পরিতাপ করতে হবে দেশ নায়কদেব। হয়তো হীরা ফেলে কাঁচ সংগ্রহেব গ্লানি তাঁদেব কর্মে ব্যর্থতাব ছাপ এঁকে দেবে। ভবিতব্যের কথা ছেড়ে দিয়ে আজ শুধু দধীচি-ধর্মী মানুষগুলোর কথাই বলে যাই—তাঁদের কাহিনী শ্রাবণ কবে ধন্য হোক আমার "নমামি"।

-শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

পরিবর্দ্ধিত ও সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'নমামির' দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল। অজ্ঞাত ও অখ্যাত লেখকের প্রথম বচনা ছয় মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়েছে। বিষয় বস্তুর আকর্ষণ এবং স্বজন-বান্ধবদের স্নেহ, প্রীতি ও আন্তরিকতার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কত প্রাণখোলা আশীর্বাদ, কত প্রীতিময় শুভেচ্ছা কত উৎসাহ, কত প্রেরণা আমি পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে তা বলে শেষ করা যায়না। তাঁদের এই কুণ্ঠাহীন প্রীতির জন্যে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'নমামি' কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা অপরিহার্য হয়েছে। বহু শ্রদ্ধেয় নায়ক, সহকর্মী ও সহৃদয় পাঠক আমাকে জানিয়েছেন বইখানি খুবই ছোট হয়েছে - আকাঙ্ক্ষা মেটেনা।

তাই "দিব্যদৃষ্টি" "বদলী" "শালগ্রামের আত্মদান" ও "প্রায়শ্চিত্ত" এই চারটী গল্প জুড়ে দিয়েছি। প্রথম গল্প "নমামি" ও কিছুটা বাড়িয়েছি। প্রথম তিনটী গল্পের আখ্যানভাগ সংগ্রহে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীআশুতোষ কাহিলী, মহারাজের "জেলে ত্রিশ বছর" আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীপ্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও বন্ধুবর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের স্নেহ ও প্রীতিকে অপমান করতে চাইনে।

'মাসীমা' গল্পটী বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। তার কারণ মাসীমা স্বয়ং। মাসীমা (শ্রীচুকড়িবালা দেবী) ও নিবারণদা (ঘটক) 'নমামি' পড়ে আমাকে আশীর্বাদ তো করেছেনই,- উপরন্তু স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনী পাঠিয়েছেন উভয়েই। তাই দিয়ে গল্পটী পরিবর্তিত করেছি।

প্রায়শ্চিত্ত গল্পটী কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় চরমদণ্ডে দণ্ডিত ভারতের অন্যতম দার্শনিক বিপ্লবী আসফাকউল্লা সম্বন্ধে। এই গল্পের কিছুটা অংশ আমি বন্ধুবর শ্রীমণীন্দ্র রায়ের রচিত "কাকোরী ষড়যন্ত্র" বই থেকে নিয়েছি। এজন্য মণীন্দ্র বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আনন্দবাজার পত্রিকায় দুইদিন 'নমামির' বিজ্ঞাপন বিনা-মূল্যে বেরিয়েছে। এর জন্য আমি পত্রিকার সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিমলা রঞ্জন প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র, কলিকাতা—মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সুযোগ্য সঞ্চালক শ্রীনীরেশনাথ ভট্টাচার্য, তাঁর সহকারী শ্রীবলাই বসু, রিডার শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য ও আমার পরম স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হতনা। ইতি—নিঃ

শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

নমামি

দুর্যোগের রাত্রি। ঝড় আর বৃষ্টি সমানেই চলেছে। আঁধারে পথ তো দূরের কথা, সামনের মানুষ—এমন কি নিজের হাত পা পর্যন্ত দেখা যায় না। এই আঁধারভরা বাদল রাতে তিনজন যুবক চলেছে হাত ধরাধরি করে—অতি সন্তর্পণে। বাত্যাতাড়িত বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে তাদের চোখে, মুখে সর্বাঙ্গে—সুতীক্ষ্ণ শরের মত। পিছল পথে একজন পড়ে যাবার মত হতেই আর একজন তাকে সামলে নেয়। আবার চলতে থাকে হাতে হাত মিলিয়ে—যথাসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। তারই আলোতে পথ দেখে নেয় তারা। ঝড়ে ধান ও পাটের চারাগুলি জড়াজড়ি করে এলোমেলো ভাবে শুয়ে পড়েছে—ঢেকে ফেলেছে পথের রেখাটুকু। তাই মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় পথ। মাঠের চারদিকের বসতিগুলোতে আলোও দেখা যায়। অথচ এই বিভ্রান্ত পথিকের দল একটু চেঁচিয়েও বলতে পারে না—"কে আছ ভাই। একটু বাইরে এস—আলো দেখাও।" কেউ দেবেনা সাড়া তাদের আহ্বানে। সারাটা দেশের বুক জুড়ে দুর্যোগ-দৈত্যের তাণ্ডব চলেছে। আর দোর জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দিব্য আরামে সকলে ঘুমে অচেতন। পথের ডাক কি পৌঁছুবে তাদের কানে? তাই নীরবেই চলছিল তিনজন। মাঝের যুবকটী চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"দেরী হচ্ছে না তো? ক'টা বাজে দেখুন না সেজদা।" ঘড়ির পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করল সামনের যুবকটী। ডান হাতে সেটা ধরেই চলতে লাগল পথ,—বিদ্যুতের আশায়। বিদ্যুৎ চমকাতে দেরী হয় না। দেখে নিল ঘড়ি—দশটা সাঁইত্রিশ।

"আরও একটু জোরে চল। সাড়ে এগারটায় পৌঁছুতেই হবে

ঘাটে।" সেজদা গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। মাঝের যুবকটীর দলীয় নাম বিমান। ঘর ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়েছে সে ভীষণ দুর্যোগে, ভীষণতাব অভিযানে। মন তার মেতে উঠেছে এক সর্বনাশা নেশায়। উদ্বেল হৃদয়ের সীমাহীন সজীবতায় গ্রাহ্যই কবে না প্রকৃতির প্রতিরোধ। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই তাবা পৌঁছে গেল ঘাটে। সারি সাবি কয়েকখানি নৌকা বাঁধা।

"হেই মা-ঝি-ই-ই—কৈ আছ,"—হাঁক দিলেন সেজদা।

"আহেন—আহেন—কর্তা"—অন্ধকাবে জবাব ভেসে আসে। পা টিপে টিপে অতি সাবধানে তিনজন অগ্রসর হল নৌকাব দিকে। নৌকায় পৌঁছে কিনাবে বসে পা ধুয়ে নিয়ে তারা ঢুকল ভিতরে। নৌকায় আরও লোক ছিল। আঁধারে জড়সড় হয়ে বসল আগন্তুক তিনজন। ঝড় বৃষ্টি কমে এলেও তখনও কিছুটা বয়েছে। তখনও বিক্ষুব্ধ মেঘনা আলোড়িত হচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। একটা আস্ফালন,---একটানা গর্জন করেই চলেছে যেন এই বিশালকায় দৈত্য। এবই মাঝে নৌকা দিল ছেড়ে। ঢেউয়েব তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে নৌকা। দাঁড়ে বসেছে তিনজন। একই তালে দাঁড় পড়ে—"ক্যাঁ-ও-ঝপ, ক্যাঁ-ও-ঝপ্।"

ঘুমের ঘোবে কখন যে বিমান এলিয়ে পড়েছে জড়সড় হয়ে ছইয়ের মধ্যে একপাশে,—তা' সে জানে না। ঘুম ভেঙ্গেই দেখে ভোরেব আলো ধীরে ধীরে আঁধারের আবরণ ভেদ কবে এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে দিক্-দিগন্তের রূপ। সোজা হয়ে বসেই বিমান দেখতে পেল নৌকায় আটজন লোক—মাঝি মাল্লা বাদে। তাদের মধ্যে একজন তার অতি পবিচিত,—অতি প্রিয়। আনন্দে মন তার নেচে উঠল। হাসিমুখে পরিচিত লোকটীর দিকে চেয়ে বল্‌ল সে, "আপনিও এসেছেন জ্যো---" কথা তাব শেষ হতে পেল না। মাঝপথে একটী ধমক খেয়ে নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল সে। মনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস থমকে

গেল্ প্রচণ্ড ধাক্কায়। তারপর সব নীরব। আটটী বোবা যেন আটকে রয়েছে একটি ঘরে। এরা হাসে না—কাঁদে না—কথা কয় না। শুধু এ ওর দিকে চায়—আর মুখ গুমড়িয়ে মনের খুশী চেপেই মারার চেষ্টা করে। কখন কদাচিৎ তার ব্যর্থতা প্রকাশ পায় ক্ষণিকের মুচকি হাসিতে। পাগল নাকি এরা।

বিমান হঠাৎ আবিষ্কার করল যে হাইলের মাঝিটি তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে চোখ মিলতেই মাঝিটা চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার যেন বিমানকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বিমানও এবার বেশ করে দেখে নিল লোকটীকে। ভীষণ কালো,—মাথায় চুলের কমতি পুষিয়ে দিয়েছে দাড়ির জঙ্গল, কদাকার,—ময়লা ছেঁড়া ধুতি পরণে,—গলায় কাঠের মালা, আর সর্বাঙ্গ অনাবৃত। বিমানের ইচ্ছা হল তাকে জিজ্ঞাসা করে নামটি কি,—কি জাত। কোনও ক্রমে এগিয়ে গেল সে গলুইয়ের দিকে। মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল—"তোমার নাম কি?"

"আঁইগ্যা? মোর নাম জিগ্যান? মোর নাম "খালীছরণ"।

খুব হাসি পেল বিমানের। "কালীচরণ" কথাটা উচ্চারণ করছে "খালীছরণ"।

"কি লোক তোমরা"—বিমান জিজ্ঞাসা করে।

উত্তর হল "নমামি।"

"নমামি। সে আবার কি?"

"আঁইগ্যা—নমামি"—আবার জবাব দেয় মাঝি। বিমান অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকে "নমামি" আবার কি জাত।

এবারে "খালীছরণ"ই সেটা বুঝিয়ে দিল।

"আঁইগ্যা খরতা! মোরা ছোট জাত। হইলাম গিয়া আমি নমো।"

এবারে বুঝল বিমান। কালীচরণ একটু তাড়াতাড়ি "নম", "আমি" এই শব্দ দুটী একসাথে উচ্চারণ করেছে, ফলে হয়েছে "নমামির" আবির্ভাব।

বেলা বেড়েই চলল। নৌকার উপরেই টীনের তোলা উনুনে পাক চড়েছে। নৌকায় দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ,—চলেছে এগিয়ে। দুই কড়াই খিচুড়ি,-- মানে চাল আর ডাল একসাথে সেদ্ধ করে তাতে নুন দেওয়া হয়েছে। হাতা তাতিযে সম্বারা দেবাব ব্যবস্থাও হয়েছে। সেজদা বলে উঠলেন, "বড়ই যে বাহাবেব খাবাব ব্যবস্থা। ভোজ দেখছি।" নীরবেই হেসে নিল সবে। একটি নির্জন স্থানে নৌকা ভিড়িযে স্নান সেবে সকলে খেয়ে নিল। আবাব চলল নৌকা। সন্ধ্যাব পব তাবা পৌছুল মণিতলার ঘাটে। ঘাটের উপবেই প্রকাণ্ড বটগাছ। সেখানে নাকি ষাট হাজাব ভূত প্রেত বাস কবে। কত অনভিজ্ঞ পথিক নাকি মারা গেছে ভূতেব হাতে। ফলে দিনেব বেলাতেই পারতপক্ষে একাকী কেউ এধাবে আসে না। বিমানও জানত এ কাহিনী। গা তার ছম্ ছম্ কবে। আর একখানা নৌকা আগেই এসেছে এই ঘাটে। তাতেও জনকয় আরোহী।

রাত্রি প্রায় এগাবোটা। দলের সাথে বিমানও হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট পবে নৌকা ছেড়ে এগিয়ে চলে নিস্তব্ধ গ্রাম্য পথে। জানত সে যে সবে চলেছে য়্যাকশানে। উত্তেজনায়, আশঙ্কায তার বুকটা ঢিব্ ঢিব কবে। নির্দেশমত সে একটী উপদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রবেশ করল এক সুদখোর টাকাব কুমীর মহাজনের বাড়ীতে। বাঁশীর সাঙ্কেতিক ধ্বনিব সাথে সাথেই যে যাব নির্দিষ্ট কাজে লেগে গেল। কেউ যাতে বাড়ীব বাইবে না যায় অন্দব থেকে, তাই লক্ষ্য রাখার ভার ছিল বিমানের। সে লক্ষ্য করল এই য়্যাকশানের সর্বাধিনায়ক এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। মাথায় পাগড়ী, প্রকাণ্ড দাড়ি, চোখে চশমা, খাকির ট্রাউজাব আর মিলিটারী সার্ট পরে সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। অবাক্ হয়ে গেল বিমান। দলে পাঞ্জাবীও আছে,---আর তারাও বাংলাদেশের কাজে অংশ গ্রহণ করে। সহসা একটী বাঁশীর

আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ম্ গুড়ম্। উত্তেজনায় বিমান হারিয়ে ফেলে কর্তব্যের নির্দেশ, ছুটে যেতে চায় গেটের দিকে। হঠাৎ কে যেন তার হাত চেপে ধবে---কঠোব স্বরে আদেশ দেয়—"ফিবে যাও অন্দরের ফটকে।"

অভিভূত বিমান চেয়ে দেখে সেই পাঞ্জাবী। কিন্তু এমন পরিষ্কাব বাংলা বলে সে! আশ্চর্য!

পর পব দুইটী বাঁশীর শব্দ। একযোগে সকলে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে অগ্রসব হল নদীর দিকে। বিমানের ব্যাচ যখন নদীতীরে পৌঁছল তখন গ্রামে ভীষণ সরগোল। নৌকার উপব থেকে কে যেন আদেশ দিল "হেই! চট্‌পট্।" বিমান দেখল একজন লোক ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেককে তল্লাসী করছে আব ধুতি, জামা বিলি কবছে। অধিকতব ক্ষিপ্রতাব সাথে চলেছে বস্ত্র পবিবর্তন। ঠিক বিমানেরই জামা ধুতি বিমানের হাতেই পৌঁচেছে দেখে সে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সকলে নৌকায় উঠে প'ল। নৌকা দিল ছেড়ে। উত্তেজনায় অধীবতায় বিমানের সাবা রাত ঘুম হল না। কি যে হয়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পাবেনি। নানা চিন্তাব দাঙ্গা লেগেছে তার মনে,—মাথা তাব ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

ভোরেব আলোব সাথে সাথেই সে চেয়ে দেখে 'নমামি'র চোখ দুটী যেন তাকে গিলছে। কি কদাকার এই মাঝিটা! আর কেনই বা সে এত চেয়ে থাকে বিমানেব দিকে। স্পাই না তো। তার মনে হল জ্যোতিদা'দের মস্ত ভুল হয়েছে অজানা মাঝির নৌকা ভাড়া করা এই ভীষণ কাজে। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করে সে অবাক হ'ল। তাবা করেছে ডাকাতি। বড বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার, ছেনী, হাতুড়ি,—অনেক কিছুই দেখা গেল কার্যের ক্ষেত্রে। বস্তা বস্তা টাকাও লুটেছে তারা। কিন্তু সে সব—এমন কি থাকি সার্ট, হাফ প্যাণ্ট কিছুই তো নাই নৌকায়। গেল কোথায়? বিমান নিজেই ঠাওর পায়না—তো

এই অজ্ঞ নিরক্ষর মাঝি বুঝবে কি ?

দুপুরে আবার রান্না হয়েছে। একটী নির্জন স্থানে স্নানাহারের জন্যে সকলে নেমে গেছে। বিমানের শরীরটা ভাল নাই, মাথাটা খুব ধরেছে। তাই সে নৌকাতেই রয়ে গেছে। আর রয়েছে "খালীছরণ।"

মাঝি এবারে বিমানের সাথে গল্প জুড়ে দিল।

"কৈ গেছলেন হাপনারা ?"—জিজ্ঞাসা করে সে।

কি উত্তর দেবে বিমান ? সে চুপ করে থাকে।

মাঝি নিজেই উত্তর দেয়—'ও-ও বিয়াবাড়ী বুঝি। 'বাজি পুড়াইন্যার আওয়াজ পাইলাম—আর হাবা গাঁ জুইড়া কি হৈ চৈ ! খুব বড ঘরের বিয়া বুঝি ?"

বিমান লক্ষ্য করল যে মাঝি কথা বলে আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি হাসে। আবার প্রশ্নের ধরণও এই প্রকার। কিছুক্ষণ পূর্বে এই মাঝিটার চাওয়ার ধরণ দেখে স্পাই বলে যে সন্দেহ তার মনের কোণে জেগেছিল এবার সেটা আরও দৃঢ়তর হ'ল। আর প্রশ্নের সুযোগ দেয়া উচিত নয় বিবেচনায় বিমান হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি করে শুয়ে পল। সত্যিই তার গা গরম হয়েছিল---মাথাটাও বেশ ধরেছে। চোখ বুজে পড়ে রইল সে। হঠাৎ সে অনুভব করল মাঝিটা এসে তার কপালে হাত দিয়েছে। বিমান মনে মনে খুব বিরক্ত হলেও ঘুমের ভাণ করেই পড়ে রইল। মাঝি ধীরে ধীরে তার কপাল টিপে, আর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। প্রথম প্রথম বিরক্তির ভাব মনে এলেও মন্দ লাগছিল না বিমানের। তার মনে হ'ল কত যত্ন কত স্নেহ মাখানো রয়েছে মাঝির হাত দুটীতে, যেন স্নেহময়ী জননী হৃদয় ঢেলে পীড়িত সন্তানের সেবা করছেন শিয়রে বসে। আহারান্তে আর আর সকলে নৌকায় ফিরে আসার আগেই মাঝি চলে গেল গলুইয়ে।

* * * *

পদ্মা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলির ধনী মহাজনদের বাড়ীতে পর পর কয়েকটী ডাকাতি হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাকাত দলের নেতা এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। প্রকাণ্ড বড তার দাডি। নদীতীরের বড লোকদের মনে সে একটা রীতিমত বিভীষিকা। কত অদ্ভুত কাহিনী রটে গেছে তাব সম্বন্ধে। কেউ বলে পুরাণেব শব্দভেদী বাণ আয়ত্ত করেছে সে,—শব্দ লক্ষ্য করেই ছোডে অব্যর্থ গুলী। কেউ বলে লাঠি ভব করে এক লাফে উঠে দোতালায়, অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পড়ে ভূমিতে। হাত দিয়ে ভাঙ্গে সিন্দুকের তালা, হুঙ্কাব দেয় দৈত্যের মত। নির্মম পাষাণ সে। অথচ কোন ক্ষেত্রেই করেনি নারীব অসম্মান। এক বাডীতে একজন দস্যু একটী মহিলার অঙ্গ থেকে গয়না খুলে নিচ্ছিল। কিন্তু সহসাই কে যেন তাকে দু'কাণ ধরে তুলে ধরল শূন্যে। সকলে চেয়ে দেখল সেই কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। এও শোনা যায ডাকাতি কবতে যেয়েও সে রোগীব সেবা কবে, বাডীর মেয়েদেব কাছে জল চেযে খায় আব বলে, "কুচ্ছু ভয় নাই মায়ি।"

এই সব ডাকাতিব ফলে পুলিশেব তৎপবতা বেড়ে গেছে অসম্ভব। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা নদীব স্থানে স্থানে লঞ্চে ও বোটে জলপুলিশের ঘাটী বসেছে। এদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বড ঘাসী নৌকা দেখেছে কি থামাবেই। একদিন কালীচবণ দুজন সঙ্গীসহ জোব চালিয়েছে নৌকা। দূব থেকে সে দেখতে পেল জলপুলিশের ঘাটী। সেই সময় পাশ দিয়ে একখানা ষ্টীমারও যাচ্ছিল। ঢেউয়ের দোলায় দোলা খাচ্ছিল নৌকাখানি। হাইলের মুঠি শক্ত করে ধরে কালীচরণ চেঁচিয়ে ওঠে—"এই বীরা। এই সোৎস্না! তরা ছাখস্ কি? লাগা পাল্লা জাহাজের লগে।" বলেই সে সবল হাতে হাইলের মুঠি ধরে ক্যাওড়া মারে আর মুখ বুঁজে শব্দ করে "উঁ---উঁ---হুঁ,---উঁ---উঁ---।" নৌকার গলুই একবাব ওঠে পাঁচ সাত হাত উঁচুতে,—আবাব পড়ে গহ্বরে—

যেন ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানি জুড়ে দিয়েছে প্রলয় নাচন। তারি সাথে সাথে নেচে উঠেছে কালীচরণের মন। শঙ্কা নাই—সংশয় নাই, যেন প্রলয়েব বুক চিরে ভ্রূক্ষেপহীন বেপরোয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ছোট্ট নৌকাখানি নিয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়েচ লেছে মাঝি কালীচবণ। বৃটিশেব যান্ত্রিক জলযান নদীর বুকে তুলেছে উত্তাল তরঙ্গ,—ঢেউয়ের পব ঢেউ,—আঘাতের পব আঘাতে চুবমাব কবে দিতে চায় নৌকাখানি। কিন্তু কালীচবণেব সবল হাতের কৌশলী চালনা এড়িয়ে চলেছে এই বিপর্যয়। নৌকা ডুবে—ডুবে—ডুবে না। আবাব ওঠে ভেসে। আব মাঝি মাল্লা দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুঞ্চিত কবে;—আবার ওঠে হেসে।

জোরেই চলছিল নৌকাখানা। কিন্তু পুলিশ ঘাটীর আড়াআড়ি যেই এসেছে অমনি একজন সিপাই চীৎকাব কবে উঠল, "এ—এ—নাইয়া। বোকো নাও"—

বেপবোয়া কালীচবণ চাপা গলায় বলে "হুঁ। ইসে—চালা জোরে।"

এইবাব পুলিশ লঞ্চ দিল ছেড়ে। দু' তিনজন সেপাই হেঁকে বলে, "বোকো—রোকো।"

কালীচবণ এইবারে নৌকা দিল থামিয়ে। পুলিশেব আদেশ মত ধীবে ধীবে এগিয়ে চলল তীরেব দিকে।

ইতিমধ্যে লঞ্চখানি নৌকার কাছে এসেছে। একজন সেপাই এগিযে এসে বল্‌লে—"এ শারোয়া! কাণমে বাৎ নেহি যাতা?"

লঞ্চেব সাথে সাথে নৌকাখানিও তীরে ভিড়ল। একজন অফিসাব হুকুম জানালেন—"উতারো"—"উতারো।"

সঙ্গীদ্বয়সহ কালীচরণ নেমে পল নৌকা থেকে। তল্লাসী সুরু হল। কিছুই আপত্তিজনক পাওয়া গেল না নৌকায়। অফিসারটী জিজ্ঞেস কোরলেন—"মাঝি কে?"

কালীচরণ এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে সেলাম ঠুকে

বললে—"আমি খরতা।"

"কেন অত জোরে নৌকা চালিয়েছিলে ?"—প্রশ্ন করেন অফিসার।

একগাল হেসে কালীচরণ জবাব দেয়—"হ করতা। ইসে জাহাজের লগে বাইজ ধরছিলাম।"

"থামাওনি কেন—ডাক শুনেও ?"

ধমকের চোটে চমকে ওঠে কালীচরণ। মুখ কাঁচু মাচু করে বলে, "হুনিনি হুজুর।"

"হুননি ? এইবার হুনিয়ে দিচ্ছি!"—রহস্য করে বলেন অফিসার। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুখ খিঁচিয়ে বলেন—"শালা ডাকাত! দেখাচ্ছি মজাটা। এই! লে চল থানামে।"

"মাফ কর হুজুর। এই হামি কাণ মলা খাই। আর করুম না এমন কাজ। হুজুর। মা বাপ। আমার পোলাপান্ না খাইয়া মোরবো। তাগো হ্যাখনের কেউ নাই। আমি হাপনার হুক্ক্যানি ছবণ ধোরত্যাছি, আমাগো ছাইড়া দ্যান্—আমাগো ছাইড়া দ্যান"—ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল কালীচরণ। সাথে সাথেই বীরা আর সোৎস্যা চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই দেখে একটী বুড়ো সিপাইয়ের মনে দয়া হল। বোধ হয় বেচারার বাল বাচ্চা ছিল। সে এগিয়ে এসে জমাদার বাবুকে বললে—"এ বাবু! এ বাবু সাহেব! ছোড়িয়ে—ছোড়িয়ে। ই লোগ একদম গঁওয়ার—বেঅকুফ হ্যয়।"

সাথী সহ কালীচরণ ছাড়া পেল। ভক্তিভরে মাটীতে পেন্নাম ঠুকে ফিরে গেল তারা নৌকায়।

এরই তিন চার দিন পরে। বড় ঘাসী নৌকাখানা সাভার বন্দরের ঘাটে ভিড়িয়ে কালীচরণ রান্না চাপিয়েছে। বীরা ও সোৎস্যা গেছে বন্দরে তেল নুন কিনতে। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাছে ভিতে একটা ডাকাতি হয়েছে। অচেনা মাঝি দেখলেই পুলিশ ধরে নিয়ে

যাচ্ছে থানায়। ভাত চাপিয়ে কালীচরণ একমনে সুতো পাক দিচ্ছে উরুর কাপড় তুলে। এমন সময় দুজন সেপাই এসে তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।

কালীচরণ থানায় গিয়ে দারোগার সামনের মাটীতে ভক্তিভরে প্রণাম করল। দারোগা বাবু বার বার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাব নাম?"

"আইগ্যা—খালীছরণ"—মাঝি জবাব দিল।

"বাপেব নাম?"

"আইগ্যা—শম্ভু।"

"তোমার বয়স কত?"—দারোগা বাবু প্রশ্ন করেন।

কালীচরণ একটু ভেবে নিয়ে চিন্তিত ভাবে বললে—"ইসে বয়সেব কথা কন্? বয়স ঢের হইছে। এই বারচৌদ্দ হইতে পারে।"

থানা সমেত সকলে একযোগে হেসে উঠল। অপ্রতিভ হয়ে কালীচরণ কি যেন বিড বিড় করে বলতে লাগল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "হ্যাঁ হুজুর। বাবচৌদ্দই হইব। হেবার গাঁয়ে যখন খুব বাঘের ভয় হইছিল—হেই যে আমাগো লাপসী গাপসী ছাগলডা লইয়া গ্যাল গিয়া হেই বাবেই তো আমি তামাক খাওন শিখছিলাম।"

আবার একচোট হাসিব ধুম পড়ে গেল থানায়। কালীচরণ বেকুবেব মত খানিকটা এধারে ওধারে চেয়ে নিল। তাবপর দাঁত দুপাটী বেব কবে মিনতিব সুবে বলল---"হুজুব। য়্যাড্ডা খতা খই। কোলক্যা নাই এহানে? গলাডা শুকাইয়া কাড্ হইয়া গ্যাছে গিয়া, প্যাড্ডা যেনি ফুল্ল্যা উঠছে"—

দাবোগাবাবু এবাবে নিঃসন্দেহে বুঝলেন কালীচরণ নিতান্তই বোকা মাঝি। সুতবাং ছেড়ে দিলেন তাকে।

নদীর আশে পাশেব গ্রামে আবও কয়েকটা ডাকাতি হওয়ায় কোলকাতা থেকে একদল গোয়েন্দা এসেছে তদন্তে। একদিন তিন-

জন সি, আই, ডি অফিসার নারায়ণগঞ্জ ঘাটে যে নৌকাখানি ভাড়া করল তার মাঝি হচ্ছে কালীচরণ। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল—"এই মাঝি। সাত আট দিন আগে এই ঘাট থেকে পনর কুড়ি-জন ভদ্দর লোকের ছেলে রাতে কোন নৌকাভাড়া নিয়েছিল?"

"খী খন্ খরতা?"—উল্টে প্রশ্ন করে কালীচরণ।

"একদল লোক গেছে এই ঘাট থেকে সাত আট দিন আগে?" কালীচরণ কি যেন মনে মনে ভাবে। তারপর জবাব দেয়, "হ—হ—খরতা। গেছিল একদল লুক। বিয়ার দল। তাগো লগে কি সুন্দর বৌ আছিল।" সঙ্গে সঙ্গেই গুণ গুণ করে গান যুড়ে দিল "খুছবরণ কন্যারে হে,—ম্যাঘ বরণ ছু-উ-ল—

বাবুরা সব হেসে উঠলেন। ইনস্পেক্টরবাবু বললেন, "কন্যার কথাতেই মাঝির মন তেতে উঠেছে। ওহে মাঝি। কি নাম তোমার?"

"আঁইগ্যা—খালীছরণ"।

"খালীছরণ? আচ্ছা। তাই সই। বাবা খালীছরণ। তোমার বে হয়েছে বাবা?"

"বিয়ার কথা খন্? কে দিব আমাগো মাইয়া? গরীব লুক, পরের লাউত খাইট্যা খাই,—বিয়া করণের টাহা পামু কৈ? ছয় সাত কুড়িতো লাগবই।"—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মনে উত্তর দিল কালীচরণ।

"কি লোক তোমরা?"—প্রশ্ন করেন ইনস্পেক্টরবাবু।

"আইগ্যা, নমামি।"

"নমামি? সে আবার কি?"

"হ খরতা—নম আমি"—বুঝিয়ে বলে কালীচরণ।

"আচ্ছা, কালীচরণ! এক বেটা পাঞ্জাবীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ এধারে? সেটা ডাকাত দলের সর্দার। যদি তাকে ধরে দিতে পার এত টাকা পুরস্কার পাবে সরকার থেকে, যে শুধু বিয়ে নয়,--বৌ নিয়ে

চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়েও দিতে পারবে।”

“হাচা কন্ বাবু?”--আহ্লাদে বিকশিত-দন্ত কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে।

“নিশ্চয় পাবে”—জোরের সাথে জবাব দেন ইনস্পেক্টরবাবু।

সোৎসুকে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে—“কইতে পারেন হে হালার চেহারাডা কি রকম”—?

“ইয়া লম্বা, ভীষণ কালো, মাথায় পাগড়ী, লম্বা দাড়ি,—বেটা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি সবই চলনসই বলতে পারে”—বাবু জবাব দেন।

রথের মেলার শোলার মোল্লার মত মাথাটা বারকতক আলোড়ন কোরে—দাঁতে দাঁত চেপে মাঝি বলে—“হাচা খই বাবু! হালার পোরে পাইলে ছাখাইয়া দিমু কেমন ‘নমামি’।”

ইনস্পেক্টরবাবু উৎসাহ দিয়ে বলেন—“যদি পার তবে দেশের জনে জনে বলবে, ধন্য তুমি ‘নমামি’।”

* * *

দলের একখানি জরুরী চিঠি নিয়ে বিমান গেল গড়পাড়া গ্রামে। সেখানকার মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার শশীবাবুকে চিঠিখানা দিতে হবে। তিনি স্কুলের সেক্রেটারীবাবুর বাসায় থাকেন। সুতরাং খুঁজে বের করতে বেশী বেগ পেতে হ'লনা বিমানের। শশীবাবুর গায়ের রং কালো, কিন্তু সৌম্যমূর্তি। সুগঠিত মুখমণ্ডলের দীর্ঘ দাড়ি এনে দিয়েছে বয়সোচিত গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি। চিঠিখানা বিমানের হাত থেকে নিয়েই তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

“আসতে কষ্ট হয়নি তো?”

“না—কষ্ট আর কি!” ঈষৎ হেসে জবাব দেয় বিমান।

“নাম—কোথা থেকে আসছ কেউ জিজ্ঞেস করেনি?”

“কৈ না। করলে বলে দেব যা'তা।”

“বেশ”—বলেই চুপ করলেন শশীবাবু। তার পর বিমানের সামনেই

খামখানি ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। তক্তপোষের উপর চিঠি-খানি রেখে একখানি কাগজ আর একটি পেন্সিল নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলি দাগ টেনে গেলেন। বিমান চিঠিখানার দিকে চেয়ে দেখে কৈ কিছু তো লিখা নেই—একেবারে সাদা কাগজ। দাগটানা হয়ে গেলে শশীবাবু কাগজখানিতে অতি সাবধানে আগুন ধরিয়ে দিলেন সেটা পুড়িয়ে। এইবার পোড়া কাগজের উপর ভেসে উঠল হরপ। কিন্তু একি? এযে অঙ্ক—ইংরাজীতে লিখা আছে—

Simplify—$\frac{3}{5}\times\frac{7}{5}\times\frac{8}{4}\times\frac{2}{7}$ ইত্যাদি।

শশীবাবু সবটা টুকে নিলেন কাগজে। তারপর কাগজের ছক্‌কাটা ঘরগুলির মধ্যে বসিয়ে গেলেন A, B, C, D ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে। এবার নীচে লিখে গেলেন চিঠির মর্ম। "Take care—Police on Track--Shift Namami" বিমান আর কিছু দেখতে পেলনা। শশী-বাবু আর একটা তক্তপোষ দেখিয়ে বলিলেন,—"বড্ড পরিশ্রম হয়েছে তোমার। ঐখানে একটু গড়িয়ে নাও।"

বিমান বুঝল তার সামনে চিঠিব মর্ম উদ্ধার করা শশীবাবুর ইচ্ছে নয়। সরে গেল সে। ,খানিকবাদে শশীবাবু বল্লেন—"নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে তোমার। অনেকখানি পথ হেঁটেছ। তা' যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়েছ তাতে সবদিন যে খেতেই পাবে তার কোন ঠিক নেই। যাক্, আজ আছে কিছু সম্বল, খেয়ে নাও। ভাত হতে অনেক দেরী।"

একটা ঝুড়ির ভেতর থেকে তিনি বের করলেন পোয়াটেক চিড়ে। বল্লেন—"চিনি, গুড় কিছুই নেই—তবে এ ফতুল্লার চিড়ে, মিষ্টি লাগে না।"—বলেই তিনি পথ দেখালেন একমুঠ চিড়ে মুখে পুরে। বিমান মহামুস্কিলে পড়ে গেল। বাড়ীঘরে থাকে সে। আহারে এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন তার অভ্যাস নাই। সুধু চিড়ে পরম সন্তোষ সহকারে খেয়ে যাচ্ছেন একটা স্কুলের হেডমাষ্টার,—সেই বা না খেয়ে করে কি!

সুতরাং একমুঠ চিড়ে মুখে পুরে দাঁতের কসরত জুড়ে দিল সে। খেতে খেতেই শশীবাবু বল্লেন—"তুমি কে জান তো?"
বিমান বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল শশীবাবুর মুখের দিকে। চিড়ে চিবানো থেমে গেল।

শান্ত কণ্ঠে শশীবাবু বললেন—"তুমি আমার ভাগনে—নাম অবনী। আসছ ইদিলপুর থেকে মা'র অসুখের খবর নিয়ে,—আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু—তোমার পৈতে আছে তো? আমরা যে বামুন।"

বিমান এবার সব বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। তার মনে খুব আনন্দও হল। এই গোপনতা,—এইরূপে নিজকে বিলিয়ে দেয়া দেশের কাজে,—নাম নাই,—পরিচয় নাই,—আছে শুধু তন্ময়তা—নীরব সাধনা,—আঁধার-ঘেরা আরাধনা,—একি কম গর্বের!

রাত্রি প্রায় একটার সময় শশীবাবুর সাথে সে রওনা হ'ল ঢাকা অভিমুখে। হেঁটে হেঁটে চলছে তারা। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পরই—শশীবাবু বললেন, "গাড়া শিব্ শিব্ কোরত্যাছে—জ্বরই কি আসে!"

কিছু পরেই প্রবল বেগে এল জ্বর। শশীবাবু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপেন,—আর পথ চলেন! ভোরের পর যতই বেলা বাড়ে—ততই জ্বর বাড়ে। ধুঁকতে ধুঁকতে এক গাছতলায় শুয়ে পড়লেন তিনি। বিমান মহামুস্কিলে পড়ে গেল। কি করে সে এখন? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কাছে ছিল একটা নালা। এক দৌড়ে নালার কাছে গিয়ে—গায়ের জামা খুলে সেটা ভিজিয়ে এনে শশীবাবুর মাথায় নিংড়ে নিংড়ে জল দিতে লাগল। প্রায় পনর কুড়ি মিনিট পরে শশীবাবু চোখ মেলে চাইলেন। বোললেন—"পিপাসা—জল।" বিমান আবার ছুটে গেল নালার ধারে। জামাটা বেশ করে ভিজিয়ে এনে নিংড়ে জল দিল শশীবাবুর মুখে।

'চল—এখন যাই' বলে শশীবাবু উঠে খাড়া হলেন। আবার সুরু

হল পথ চলা। কয়েক মাইল যেয়ে তিনি শুয়ে পলেন। বিমান আবার জামা ভিজিয়ে জল এনে তাঁর মাথায় নিংড়ে দেয়,—তাঁর মুখে দিয়ে পিপাসা মেটায়। সংজ্ঞা ফিরে এলে বিমানের দিকে চেয়ে শশীবাবু সস্নেহে বললেন, 'বড়ই' মুস্কিলে পড়েছ তুমি। কি আর কই! আমার শরীরডা এক্কেবারেই অকেজো হইয়া গ্যাছে! আজ আমার কত কাজ,—আজ কি জ্বর হওন উচিত!"

বিমান আশ্চর্য হয়ে গেল শশীবাবুর ধরণ দেখে। জ্বর হয়েছে,—সেটাও যেন মস্ত অপরাধ। গ্লানিতে আপশোষে তাঁর সমস্ত অন্তরটাই যেন ভরে গেছে।

গভীর রাতে তারা পৌছাল ঢাকায়। বিমান নিজের বাসায় চলে গেল। যাবার আগে শশীবাবু তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, "ঢের কষ্ট পাইছ আমারে লইয়া। এখন যাও গিয়া।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় বিমান একখানি বইয়ের খোঁজে সদর ঘাট লাইব্রেরীতে গিয়ে শুনতে পেল প্রায় আধঘণ্টা আগে বুড়ীগঙ্গার ধারে একজন সি, আই, ডি অফিসার খুন হয়েছে। আততায়ীকে অনেকেই দেখেছে। তার নাক লম্বা, দাড়ি আছে। তাকে ধরবার জন্যে কয়েকজন নাকি এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটী এমনই আশ্চর্য যে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে দাড়ি নাড়তে নাড়তে গম্ভীরসে পাড়ি দিয়েছে।

এই ঘটনার দুইদিন পরে কোলকাতার ইডেনগার্ডেনে একখানি বেঞ্চে একটী লোক বসে বসে কাশছে। শুকনো মুখ,—ময়লা পোষাক, রুক্ষ চুল দাড়ি, চোখে মুখে একটা হতাশার ভাব। হরদম কেশেই চলেছে সে। ইতিমধ্যে একটী আই, বি স্পাই এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসে চেয়ে চেয়ে দেখছে কেশো রোগীটিকে। দাড়ির দিকেই তার বিশেষ মনোযোগ। খানিকটা ইতস্ততঃ করে সে দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কি?"

লোকটী তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে বললে সে—নাম ব্র—জ——

পরবর্ত্তী অংশটুকু ঢেকে দিল কাশিতে।

স্পাইটী প্রশ্ন করল—"অসুখ নাকি ?"

লোকটী মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল "হ্যাঁ।" তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললে, "থাইসিস্ বলে সকলে সন্দেহ করে।"

এবাবে স্পাইটী উঠে দাঁড়ালো। সহানুভূতির সুরে বললে—'বড পাঁজি জিনিষ ! ভীষণ ছোঁয়াচে। খবরদার যেন বে থা করবেন না।"

আবার ফাঁৎ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাড়িওয়ালা। থম্ থমে ভারী গলায় সে বল্লে—"আমার দুই বিয়ে। এখন ভরসা"—আকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করল সে।

স্পাই প্রভু দৃষ্টিপথের বাহিরে গেলে জলের ধারে বসা একটী যুবকের কাছে উঠে গেল লোকটী। যুবকটী একখানা চিঠি দিল তার হাতে। খুলে পড়ে দাডিওয়ালা বললে—"শশাঙ্ক বাবুকে বোলো আজ রাতেই আমি পূর্ববঙ্গে চলে যাব। তিনি যেন চন্দননগবে যেয়ে পূব আর পশ্চিমের বিষয় সব ঠিক করে আসেন।"

যুবকটী প্রশ্ন করল—"আপনাব নাম কি বলব ?"

একটু ভেবে নিয়ে দাড়িওয়ালা উত্তর দিল, "শশীবাবু।"

দুজনে দুদিকে চলে গেল।

সপ্তাহ দুই পরে।

নারায়ণগঞ্জে বিরাট আলোড়ন। শহরে জোর গুজব ঢাকায় ডাকাত দলের নেতা ধরা পড়েছে। প্রকাণ্ড তার দাডি। এই দাড়িওয়ালাই পাঞ্জাবী সেজে ডাকাতি করত। সদব ঘাটের খুনও করেছে সে। তার কাছে নাকি একটা 'হুইসেল' পাওয়া গেছে। শহর ভেঙ্গে লোক ছুটছে কোর্টের দিকে আজ তাকে নাবায়ণগঞ্জ কাচারীতে হাজির করা হবে।

"পাঞ্জাবী ডাকাত", "সদরঘাটের খুন" প্রভৃতি গুজবে বিমানের মনেও জেগেছে কৌতূহল। সেও গিয়েছে কোর্টে। গিয়ে দেখে আদালত প্রাঙ্গনে পুলিশ আর সি, আই, ডি গিজ গিজ করছে। ঠিক এগারোটার সময় হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ দস্যু সর্দারকে কাচারীতে নিয়ে এল। ভীড়করা জনতা পুলিশের ধমক খেয়ে সরে গেল দূরে। এবার স্পষ্টই দেখা যায় পুলিশ ডাকাতটাকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কাঠগড়ার দিকে। কিন্তু তাকে দেখেই বিমান বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে গেল। একি? এযে শশীবাবু!

বিমানের পাশেই দুজন সি, আই, ডি অফিসার আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। একজন বলছে—"খুব ধরা পড়ে গেছে যা হোক। খবরটা না পেলে এর গায়ে কিন্তু হাতও দিতাম না আমরা। খুব বাহাদুর বটে! অপর একজন বোললে—"বাহাদুর বলে বাহাদুর! এই তো কয়েকদিন আগে ইডেন গার্ডেনে কি শেয়াল ফাঁকিটাই দিয়েছে আমাকে। খক্ খক্ কাশি। বলে কিনা থাইসিস্, তারপর আবার ডবল বিয়ে। ফলে আমাকে বোকা বানিয়ে ভেগে এসেছে। দাড়িটা দেখে আমার মন উস্খুস্ করছিল। কিন্তু থাইসিস্ আমাকে ফাঁকি দিল। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার হাত ছাড়া হয়ে গেল।"

প্রথম জন আবার বললে—কিন্তু যাই বল ভাই এরা মানুষ না দেবতা ভেবেই পাইনে। এত বড় একটা লোক, আদর্শ চরিত্র বলে বিপ্লবীরা যাকে শ্রদ্ধা করে অন্তর দিয়ে,—সেই ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী কিনা নৌকাচুরি করে জেল খেটেছে। বাইরে এসে মাঝি সেজে ঝড়, বাদল, শীত, গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে মাসের পর মাস কাটিয়েছে নদীর বুকে, পাঞ্জাবী সেজে করেছে ডাকাত দলের নেতৃত্ব, কিছুদিন আগেই ঢাকায় সাফাই হাতে বিকেল বেলা খুন করেছে, আমাদেরও দিয়েছে ফাঁকি, নাম বলেছে "খালীছবর", জাত বলেছে "নমামি"—

বিমানেব মাথা ঝিম ঝিম কবতে লাগল। অপাব বিস্ময় তার মনে। দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এল, কাণে পৌছে না কোনো কথা—মনেব মধ্যে লণ্ডভণ্ড এলোমেলো ভাব। কিছু পবে সে যেন সম্বিত ফিবে পেল আদালতেব পিযনের হাঁক-ডাকে। অদ্ভূত ব্যাপাব! মাঝি কালীচবণ নিরক্ষর গেঁয়ো লোক—যে নিজেব নামটাও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ কবতে পারে না,—যাকে সে স্পাই বলে ঠাউবেছে—সেই কিনা ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তি যাঁর নাম শুনেছে সে অজস্র বাব, যাঁর দেবোপম চবিত্র,—নির্বাক নিষ্ঠা যুবকের দলে যোগায পথেব প্রেবণা! তিনিই আবাব পাঞ্জাবী সেজে য়্যাক্‌শন পরিচালনা কবেছেন; তালতলাব ডাকাতিতে তো বিমানেব হাতই চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু নৌকায় ফিরে কালীচবণ মাঝিকে তো যথাস্থানেই দেখেছে বিমান। তাবপব সদব ঘাটেব খুন! এ যে অসম্ভব ব্যাপাব! অসুস্থ শশীবাবুকে গড়পাড়া থেকে সেই তো ঢাকায নিয়ে এসেছে। শশীবাবুই কি কালীচবণ? তিনিই কি পাঞ্জাবী নেতা? কোন মীমাংসাব সূত্র খুজে পেলনা তাব মন। কাঠগড়ায় অসামীব দিকে বাব বাব চেযে দেখল সে। মনে হল তাব, সব মিথ্যে অথবা ভোজবাজী। এ যে শশীবাবু—গড়পাড়া স্কুলের হেড মাষ্টার শশীবাবু। ঐ তো বিমানেব দিকে আড চোখে চেয়ে চেযে হাসছেন তিনি,—ঈঙ্গিতে বলছেন চলে যাও চলে যাও। এই শশীবাবুই কি নিরক্ষব মাঝি কালীচবণ, পণ্ডিত আর মূখেব যুগপৎ প্রকাশ? তিনিই আবাব য্যাকশানেব অধিনাযক এবং হত্যাকাবী? শান্ত শশীবাবুই ভযাল দস্যু—নির্ম্ম হত্যাকাবী?

বিমানেব চিন্তা খেই হাবাল। হাটেব কোলাহল থমকে দাঁড়াল চৌবাস্তায় এসে। দিশেহাবা অভিভূতেব মত যখন সে ধীবে ধীবে বেরিযে এল কাচাবী ঘব থেকে তখন তার মুহ্যমান সমগ্র চেতনা জুড়ে ওত প্রোত ভাবে সঞ্চাবিত হচ্ছে একটি মাত্র ধ্বনি—নমামি—নমামি—নমামি।

দিব্য-দৃষ্টি।

অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা মহানায়ক ব্যারিষ্টার, পি, মিত্রের ডান হাত শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাস। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ভার তাঁর উপর। তাঁর সার্থক নেতৃত্বে ও কর্মকুশলতায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দলে দলে যুবক সমিতির সভ্য হয়েছে। সমিতির কর্মধারা—লাঠিখেলা, অসি চালনা, কৃত্রিম যুদ্ধ, বেপরোয়া সাহসিকতা সমস্ত দেশটাকে উদ্বেল করে তুলেছে। পুলিনবাবু নিজের যথা সর্বস্ব—এমনকি স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে সমিতির ব্যয় নির্বাহ করেন কিন্তু তাতেও প্রয়োজন মিটেনা। তাই অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ডাকাতি সুরু করেছেন। এতে সরকারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত হল বটে, কিন্তু খুন, ডাকাতির জন্যে দুঃখ বরণ, বীরত্ব, সাহসিকতা, ফাঁসি, জেল সবটাতে মিলে একটা রোমান্টিক আকর্ষণের সৃষ্টি করল যুবক মহলে। এতে কর্মীও যাচাই হয়ে যেত। যাদের মন দুর্বল,—ভীরুতা আছে অন্তরে—তারা ছুতো নাতা ধরে সরে পড়তো।

পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি সত্ত্বেও সমিতি বেড়েই চলেছিল।

তারপর এল আঘাত। পুলিনবাবুকে ধরে নিয়ে গেল—সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল। পুলিনবাবুর সহকারীদের মধ্যে কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীমাখনলাল সেনের উপর নেতৃত্বের ভার পড়ল। তিনি সমিতির কেন্দ্র ঢাকা থেকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন। এবারে চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায় ও শ্রীশ্রীশ ঘোষের দলের সাথে অনুশীলন সমিতি একেবারে মিলে গেল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মাখনবাবুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন কোন বিশিষ্ট কর্মীর মনে সন্দেহ দেখা দিল। তাদের মনে হ'ল মাখনবাবু সমিতির বৈপ্লবিক গতির মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছেন,—সমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের লেজুড় করে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ

করবার ভরসা পায়না। "নেতার আদেশ অবিচলিত চিত্তে মানতে হবে" এই অনুশাসনের তলে বিপ্লবকর্মী যুবক দলের বিদ্রোহী মন নিয়তই গুমরে মরে।

বুদ্ধিমান মাখনবাবু এই ধূমায়িত বিদ্রোহের আভাস পেলেন। তিনি দলের বিশিষ্ট কর্মীদের ডেকে খোলাখুলি আলোচনা করলেন। সকলের সামনে স্পষ্ট করে বললেন "আমরা চাই দেশের মুক্তি। আমাদের হতে হবে আদর্শ সন্ন্যাসী। খুন ডাকাতির দুর্নীতি যদি আশ্রয় করি, এই নৈতিক অপরাধেই আমাদের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের লোকও আমাদের খুনী ডাকাত বলেই জানবে। তাদের সমর্থন, সহানুভূতি হারাব আমরা।"

মাখন বাবুর কথা শেষ হতে পেলনা। একটী কৃষ্ণকায় যুবক মাঝ-পথে প্রতিবাদ জানাল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে "বলল—আমি একটা কথা জিগাই। পুলিনবাবু যখন নিজের যথা সর্বস্ব, এমনকি স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বেইচ্যা সমিতির কাজ চালাইলেন তখন সকলেই তেনারে বাহবা দিলেন,—আমাগো ভিক্ষার ঝুলিতে বিশেষ কিছু তো দেন নাই। তাই না শ্যাষে বাধ্য হইয়া পুলিন বাবু ডাকাতির পথ লইছিলেন। আমার মনে লয় ভিক্ষায় চলতে পারে রামকৃষ্ণ মিশন,—বিপ্লবের আয়োজন চলন সম্ভব নয়।"

Pin drop silence, সকলে নীরবে চেয়ে দেখল এই যুবকটীকে, যার কণ্ঠে নেতার আচরণের প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। এইবার ফিস্ ফাস্ করে প্রচারিত হল যুবকটীর পরিচয়,—সরকারী কর্মচারী—জবরদস্ত ডেপুটী ইনস্পেকটর অব স্কুলস, প্রভাত সেনের পুত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, জি, গুপ্তের ভাগনে—ঢাকার নরেন সেন।

মাখনবাবু বললেন—"নীতির কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ডাকাতিতে কি আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন হারাব না?"

"না—হারাইতামনা।" উত্তর দিল যুবকটী। "আমবা জানি খুন, ডাকাতি আমাগো লক্ষ্য নয়। ইয়ার লাইগা পুলিশ আমাগো পিছনে লাগব—হেও মানি। কিন্তু করুম্ কি? কে দিব আমাগো টাকা? জন সাধারণের সমর্থন হারাইবার ভয় মিছাই করি। কারণ ধনী, জমিদার, মহাজন—যাগো বাড়ী আমরা ডাকা দিমু—তাগো গরীব জন সাধারণ ভাল চক্ষে ত্থাখেনা। তাগো লুটলে সাধারণ লোক খুশীই হইব। আব খুনেব কথা কন্। আমাগো পথে যারা বাধাব স্থষ্টি কোরব—তাগো সরাইতে হইব। আরো যে সব কর্মচারী অত্যাচারে অত্যাচারে জনসাধাবণরে তাতাইযা তুলছে তাগো সরাইলে সকলের সমর্থনও পামু,—প্রচারও হইব।"

চাপা গুঞ্জন ধ্বনি দ্বারা বেশীর ভাগ কর্মীর হৃষ্ট সমর্থন লাভ করল নবেন সেনের উক্তি। মাখনবাবু তা বুঝলেন। বললেন—"জানিনা সকলেই এমত সমর্থন করে কিনা। যদি করে তা' হ'লে চলতেই হবে আমাকে ভিন্ন পথে। কারণ সমাজের নীতি বিরুদ্ধ পথে চলার কোন সার্থকতা—আমি খুজে পাইনা।"

মাখনবাবু সবে গেলেন। একদল বিশিষ্ট কর্মী যাঁরা মাখনবাবুর নীতিতে আস্থাবান ছিলেন, তাঁবাও সরে গেলেন সাথে সাথেই। এঁদের মধ্যে শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রিযনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীদীনেশ মুস্তফি ও শ্রীনগেন সরকার রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন। মিশনে যোগদান করে বিদেশে গিয়ে ভারতের অনুকূলে প্রচাব কার্য চালানো ও অর্থ সংগ্রহণ ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু গেরুয়ার মাহাত্ম্যে মনও তাঁদের বদলে যায়,—তাঁরা পরে মিশনের বড বড সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন।

নরেন্দ্রনাথ এইবার তাঁব সহকর্মী ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী, রমেশ আচার্য্য, জ্ঞান মজুমদার, রবি সেন, মদন ভৌমিক, নগেন দত্ত, ফেগা রায়, যোগেন চক্রবর্ত্তী, অমৃত সরকার প্রভৃতিব সহযোগে

দলটী গুছিয়ে নিতে লাগলেন। জীবন ঠাকুরতা, আশু কাহিলী প্রভৃতি পালংয়ের বিশিষ্ট কর্মীরা কিছুকাল চিত্তদোলায় দুলে ঝাঁপিয়ে পলেন নরেন সেনের সাথে। নীতিগত প্রশ্নের দমকা হাওয়ায় সমিতির তরণী হাবুডুবু খেতে খেতে রক্ষা পেল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগিদের ঐকান্তিক বৈপ্লবিক আগ্রহে। এই প্রবল ধাক্কায় দলের সজীবতা প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে আড়ষ্টভাব কাটানোর জন্যে পর পর কয়েকটা ডাকাতি ও খুনের ব্যবস্থা করলেন নরেন্দ্রনাথ। গোয়ালন্দের প্ল্যাটফরমে স্যালেন সাহেবকে গুলী, নগেন্দ্র দত্তের (গিরিজাবাবু) পরামর্শ ক্রমে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের ব্যভিচারী মোহান্তকে হত্যা, শ্রীহট্টে জগৎশী অরুণাচল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের গুলী করে হত্যার প্রতিশোধে মহকুমা হাকিম গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্যোগ এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিনে নরেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক অগ্রগতির এই প্রচেষ্টা ধন্য হয়েছিল তাঁর মাতার আশিস্ ধারায় স্নাত হয়ে। সরকারী কর্মচারীর বাড়ী। সদর দোরে ভারী কড়াকড়ি। কিন্তু খিড়কীর দোর খোলা। দুপুর রাত পর্যন্ত কখনও খিড়কীর দোর দিয়ে—কখনও প্রাচীর টপ্‌কে দলের ছেলেরা অন্দরে প্রবেশ করে,—আর চাপা গলায় ডাকে—"মা! মা! খিদা লাগছে—খাইতে দ্যান্।" নরেন্দ্র জননী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে ভাত বাড়েন আর বলেন—"সময় মত খাইতে পার না? আয়নায় দ্যাখছনি চেহারাডা! কি হইয়া গ্যাছে গিয়া! শরীর খুয়াইলে দ্যাশের কাম করবা ক্যামতে?" মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড একখানা থালার চার পাশে খেতে বসে এই হতভাগার দল। কেউ বলে "এ যে পূজার থালা!" জননী স্নেহগদগদ কণ্ঠে বলেন "আমার পোলারা যে দ্যাবতা! তাই না দিছি পূজার থালা!" স্নেহে, করুণায় তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করে উঠে। মরু যাত্রীরা মরুদ্যানের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়।

ফরিদপুর জিলায় ঘরিসারে য়্যাক্‌শানের প্ল্যান করা হয়েছে।

আয়োজন সম্পূর্ণ। এই সময় খবর পাওয়া গেল নদী থেকে বেরিয়ে যে খাল দিয়ে নৌকা যাবে সেখানে জলপুলিশ মস্ত ঘাটি বসিয়েছে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কে কে যাবে তাও ঠিক। এতদূর অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন উঠলো এই য়্যাক্‌শানে হাত দেযা হবে কিনা। বীরেন চ্যাটার্জি বলল—"ফুঃ—তোর জল পুলিশ! জল-পুলিশরে জল-সই করুম্‌। বাহার লড়াই আবার হইব ভাবতেই আনন্দে মনডা আমার নাইচ্চ্যা উঠে সামনেই তো হোলি জলের মধ্যে পুলিশের লগে হোলি খেলা খুব মজাদার লাগব। রংমে কেইসে খেলুঁ হুলিয়া পুলিশোয়াকে সঙ"—গান যুড়ে দিল বীরেন। সকলে উঠলো হেসে—গম্ভীর হলেন নরেন সেন। তিনি রবি সেনকে ডেকে বললেন "যে সে যাইব,—তা গো মত লও।"

হেসে বীরেন বলল—"ইসে তাজ্জব বানাইলেন দেখত্যাছি! ডাকাতিতে গণতন্ত্র,—ভোটাভুটী! 'হে প্রভু যীসু! টুমি হামাডের রক্ষা কর!" আবার সমবেত হাসি। নরেন বাবু কিন্তু অচল অটল। বললেন "এডা ডাকাতিতে গণতন্ত্র নয়—দলে গণতন্ত্র যে জিনিষ প্রতিষ্ঠার তরে আমাগো লড়াই তার গোড়াপত্তন হইব আমাগো দিয়াই।" হেসে বললেন—"সকলরে লইয়াই সমিতি—সমিতিও সকলেরই। সব কিছু কাজকর্ম যদি একমাত্র আমার মতেই হয় তা' হইলে তো এ দ্যাশে রাজতন্ত্র কায়েম হইব,—আমি রাজা হমু গিয়া!"

বীরেন এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—

হে আর্য! বিধিমতে জনমত কর নিরূপণ—
নাহি তাহে বাধা;
কিন্তু এই দীন সেবকের, আছে শুধু একটী বিধান—
'দাদা আর গদা'।

হো হো করে সকলে হেসে উঠল। নরেন বাবু বিরক্ত হয়ে

বললেন—"থাম্ বীবা!" পবক্ষণেই তিনি হেসে বললেন—পাজিডাব উপর রাগ করণও মুস্কিল! মুখ ভ্যাঙ্গায়"

সকলের মত নেয়া হ'ল। প্রায় সকলেই একবাক্যে সম্মতি দিল ডাকাতির পক্ষে। ডাকাতিও হ'ল,—টাকাও এল' এলনা শুধু বিপদ। আশেপাশে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে এ খেয়ালই যেন নাই প্রভুদেব

একদিকে নবেন সেনেব নেতৃত্বে খুন আব ডাকাতিব বহব লেগে যায়,—অন্যদিকে বিশিষ্ট কর্মীদেব আবও অনেকে দলত্যাগ ক'বে। এবারে যাঁবা সবে পলেন তাদেব মধ্যে ছিলেন শ্রীমনোবঞ্জন ভট্টাচার্য (খ্যাতিমান্ নাট্যকাব), শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ (পঃ বঙ্গেব প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী) ও শ্রীললিত বাবডী। সকলেবই দলত্যাগ নীতিগত প্রশ্নে। নবেন বাবু কিন্তু বিচলিত হলেন না। মবণ-মাবণেব ভীতি-শঙ্কুল বিপ্লববহুল কর্মধাবায় তিনি প্রত্যেকটী কর্মীকে যাচাই কবে নিতে চান। একবাব এক ডাকাতিতে তিনি নিজেও যাবেন স্থিব কবেছেন। ববি সেন আব অমৃত সবকাব আপত্তি কবে বললেন— "আপনাব যাইযা কি দবকার? আমরা তো আছিই! সমিতিব সব কিছু অখন আপনাব উপবেই নির্ভব কবত্যাছে।"

"ভুল—ভুল—ববি! তোমবা মস্ত ভুল কবত্যাছ। তোমাগো সমিতিব নেতা নৈবেদ্যেব কলা নয। সাহসে, বীর্যে, বুদ্ধিতে, ত্যাগে তার প্রমাণ করতে হইব যে সে নেতা হওনের যোগ্য। আব আমাগো বিপ্লব দল—গণতান্ত্রিক দল। জনে জনে সক্কলে মিইলা হেব নেতা। চলতি গণতন্ত্রের লগে আমাগো difference এই যে আমাগো নির্বাচন নাই—ভোটাভুটী নাই। কাজেব মধ্য দিয়া যোগ্যতাব জোবে একজন আব একজনরে ছাড়াইয়া যায়। কাজেব মধ্য দিয়াই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যোগ্যতব কর্মীবা নেতৃমণ্ডলে আইয়া পৌছায অত্যন্ত স্বাভাবিক নিযমে।"

* * * * *

কোলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে একখানি বাসা। লিণ্ডিয়া আইস্ ফ্যাক্টরীর মেকানিক অমৃত হাজরা থাকেন সেখানে। তাঁর দলীয় নাম শশাঙ্ক। এই বাসায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নায়কগণ এসে সমবেত হন। চন্দননগর থেকে শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীশ্রীশ ঘোষ, মনীন্দ্র নায়েক প্রভৃতি নেতারা প্রায়ই সেখানে আসেন। উত্তর ভারত থেকে শ্রীরাসবিহারী বসু, শ্রীশচীন্দ্র সান্যাল, শ্রীমন্মথ বিশ্বাস, শ্রীবসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতিকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাসায় হরদম বোমা তৈরী হয়। চন্দননগর থেকে শ্রীমনীন্দ্র নায়েক মাঝে মাঝে এসে তত্ত্বাবধান করে যান তিনিই বোমা তৈরীর ওস্তাদ।

১৯১১ সালের মধ্যভাগে একদিন একটী টিকিধারী—পশ্চিমে যুবককে বাসার সামনে দেখা গেল। সে যেন কাকে খুজছে। মণ্ডিত-মস্তক, মোটা একগোছা টিকি, হাটুর উপর ধুতি—অথচ গায়ে লম্বা কোট। বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। বাসার উপর বাড়ির থেকে নজর রেখেছিলেন রবি সেন। তিনি পশ্চিমেটীর গতিবিধি দেখে জিজ্ঞেস করলেন "কেয়া মাংতা?"

লোকটী একদৃষ্টে রবিবাবুকে দেখে নিল, তারপর চাপা গলায় বলল—"আপনি রবিবাবু না?"

রবিবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন 'হ্যাঁ। লোকটী বললে—"আমি শচীন সান্যাল। কাশী থেকে আসছি। রাসুদাও এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজন।"

উভয়ে বাসায় ঢুকলেন। সন্ধ্যার পর জরুরী মন্ত্রণা সভা বসেছে। শ্রীশবাবু, রাসবিহারী চন্দন নগর থেকে এসেছেন।

রাসুদা বললেন—"দিল্লীতে সাড়ম্বরে দরবার হবে ঠিক হয়েছে। এই অবসর। একটা কিছু করতেই হবে এবারে। বড়লাট হার্ডিঞ্জের

উপব যদি বোমা মাবি সারা ভারত কেঁপে উঠবে সে আঘাতে। বৃটিশের সাধেব সাম্রাজ্যেও থবহরি কম্প দেখা দেবে।"

চিন্তিত ভাবে নরেনবাবু বললেন—"কিন্তু এডা যে এক্কেবে সন্ত্রাস-বাদ খ্যাষে সন্ত্রাসবাদেব অতল জলে বিপ্লবের কল্পনাডা ডুব্ব্যা মবব না তো? আমাগো সর্বদাই হুঁসিয়াব বইতে হইব,—মবণমাবণের নেশায় ভাইস্যা না যাই!"

বাসবিহাবী বললেন—"হোক এটা সন্ত্রাসবাদ। বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যে প্রয়োজন আছে এব। সমস্ত দেশটা ঘুমে অচেতন! তাকে জাগাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির দবকাব। তাবপব বিভিন্ন দেশে হবে এব প্রতিক্রিয়া। জগত বুঝবে ভাবত সুখে শান্তিতে আছে বলে ইংবেজবা যে অপপ্রচাব কবে,—সেটা মিথ্যা। তাবপর আমাদেব দেশেব নেতারা বছবেব পব বছব সে সব দাবী জানাচ্ছেন সবকাবেব কাছে—যাকে লক্ষ্য কবে ঘৃণায় উপেক্ষায কার্জন বলেছে "Let the dogs bark,—the caravan passes on!—তার দিকেও কার্জনী প্রভুদেব দৃষ্টির মোড ফিববে;—বুঝবে তাবা কুকুব শুধু ঘেউ ঘেউই কবেনা,—কামডায়ও।"

শান্তভাবেই নবেন বাবু বললেন "হ—এইডা ঠিক কইছেন। আমাগো প্রত্যেক কর্মই বিচাব করণ লাগব বৈপ্লবিক মূল্য দিয়া। অগ্রগতি আমাগো সব কাজেব কষ্টিপাথর। এই কাজ দ্বাবা যদি বিপ্লববাদেব প্রচাব বা প্রসাব হয়,—নিশ্চয় তাতে হাত দিমু আমবা।"

সকলেই হৃষ্টচিত্তে রাসবিহাবীর প্রস্তাব অনুমোদন কবলেন। তিনি আব শচীন বাবু কয়েকটী বোমা নিয়ে ফিবে গেলেন উত্তব ভারতে।

দিল্লী দববাবেব দিন। বিবাট মিছিল। কাতারে কাতাবে লোক মিছিল দেখতে এসেছে। ছাদের উপব পুবনাবীবা বিচিত্র বসনে সজ্জিত হয়ে মিছিল দেখছে। রাসবিহারীও এসেছেন মিছিল দেখতে।

তাঁর সাথে নারীবেশে বসন্ত বিশ্বাস। বসন্ত একটী ছাদের উপরে উঠে মহিলাদের মধ্যে মিশে গেল।

হাতী চড়ে লেডী হার্ডিঞ্জ সহ বড়লাট আসছেন। অজস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"Long live the king—God save the king," ব্যাগপাইপেও বেজে উঠছে ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত। ছাদ থেকে নারীরা হুলুধ্বনি দিচ্ছে,—পুষ্পবর্ষণ করছে বড়লাট দম্পতির উপর। বড়লাট ঠিক যখন বসন্তর মুখোমুখী এসেছেন বসন্তর আঁচল নড়ে উঠল। পাশের একটী মহিলা সে দিকে চাইতেই বসন্ত বলল—"কেয়া তামাশা দেখো বহিন—সামনে নজর রাখো।" মহিলাটী যেমনি সামনে তাকিয়েছেন—অমনিই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ও আর্তনাদ। ভীতি বিহ্বল নরনারী ছুড়দাড় করে পালাতে লাগল। বসন্তও নেমে এসে দূরে রাসবিহারীর সাথে মিলিত হ'ল।

বোমার বিস্ফোরণে ঘর বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল। সেই সাথে কেঁপেছিল ইংরাজের সুখের ঘর।

পুলিশ মহলের পীলে চমকে উঠেছে। বাংলা পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্তা বসন্ত চাটুয্যে উঠে পড়ে লেগেছেন বিপ্লবীনিধনে। পূর্ববঙ্গে তখন জোর চলেছে কাজ। চাটুয্যে মশাই ছুটে এসেছেন ঢাকায় ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র আবিষ্কার কোরতে। কিন্তু ব্যাপারটা যতই গোপন হোক নরেন সেনের কাণে আগেই পৌঁছেছে। হঠাৎ সদর ঘাটে সন্ধ্যার সময় দু'জন সি, আই, ডি কর্মচারীর সাথে চাটুয্যে মশাই আক্রান্ত হলেন। একজন পড়ে গেল গুলী খেয়ে—চাটুয্যে মশাই বুড়ীগঙ্গায় ঝাঁপ মেরে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

কিন্তু এখানেই আক্রমণের সমাপ্তি ঘটল না। একদা সন্ধ্যায় কোলকাতার মুসলমানপাড়া লেনে অবস্থিত তাঁর বাসায় বোমা পড়ল। তিনি দৈবক্রমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু আক্রমণকারীদের একজন—

নগেন সেন—আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পডল। ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, কালী মৈত্র, সতীশ পাকডাশী কোনও ক্রমে বেচে গেলেন অলি গলি ঘুরে।

এব পবেই কোলকাতাব গ্রীয়াব পার্কে আলোচনাবত নরেন সেন আব আদিত্য দত্ত ধবা পডেন—বীবেন চ্যাটার্জি লোম্যান সাহেবেব হাত মট্‌কে দিযে কোনপ্রকাবে পালিয়ে যান।

অনেক দিন পবে। গৌহাটীব মামলায় তিন বছব কবে সশ্রম কাবাদণ্ডেব আদেশ নিযে তাবা প্রসন্ন দে আব প্রভাস লাহিডী এলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। এসেই তাঁবা জানলেন এক স্বদেশী সাধু পাগল হয়ে গেছেন। তিনি জেলাব বড সাহেব সকলকেই যখন তখন গালিগালাজ কবেন,—আব বলেন "মানিনে তোগো ইংবাজেব বাজত্ব।"

জেলাব বড বায়ান হেসে উত্তব দেন—"একা না মানলে কি ক্ষতি হবে আমাদেব বাজত্বেব ? আপনি একা কি কবতে পাবেন ?" সাধু উচ্চৈঃস্ববে হেসে উঠেন। বলেন "চক্ষু বইতে যাবা অন্ধ তাগো দেখামু ক্যামন কইবা! জান সাহেব আমি কি দেখত্যাছি ?"

"কি ?" বায়ান সাহেব প্রশ্ন কবেন।

"আমি দেখত্যাছি তোমাগো অত্যাচাব সীমা ছাডাইয়া গ্যাছে গিয়া। কাঁদলেও তোমরা গুলি কব। মানুষরে পশু বানাইতে চাও। তাব ফলে আগুন জ্বলছে সমস্ত দ্যাশটায। হাজাবে হাজাবে লাখে লাখে ভাবতবাসী চীৎকাব কইবা বলত্যাছে মানিনা ইংবাজেব শাসন, —দস্যুব বাজ্য ধ্বংস হউক। তোমাগো বেত, বন্দুক, বেয়নেট হে চীৎকার থামাইতে পাবত্যাছেনা,—তোমরা পাগলেব মতন ছুটাছুটি কবত্যাছ—ক্ষ্যাপা কুকুবেব মতন ফালাফালি জুইডা দ্যাছ। অখন বুঝছ আমি একা না ?"

জেলাব সাহেব হাসতে হাসতে ফিবে যান্—আব বলেন "একদম পাগল হো গিয়া।"

পাগলা সাধু তিন আইনের রাজবন্দী। তাঁকে যেসব ফলমূল খেতে দেয়া হয় সে সব তিনি ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেন বাহিরে। সেপাইরা তা কুড়িয়ে নিয়ে পাগড়ীর ভেতর গুজে,—কয়েদিরা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে গুঁজে আর হাসে। একদিন চটকল থেকে কাজ করে শালকিয়া স্যুটিং কেসের বন্দী শ্রীযুগল কিশোর দত্ত যাচ্ছেন ষ্টেট ইয়ার্ডের সামনে দিয়ে। হঠাৎ কাগজে মোড়া একটা বেদানা পড়ল তাঁর সামনে। মোড়ক খুলে তিনি দেখেন বেদানাটা মাঝামাঝি কাটা আর তার ভেতরে একটুকরো কাগজে লিখা আছে "খবর পেয়েছি প্রভাস আর তারা এসেছে। কেমন আছে? একবিল্লা কানা জামাদারের মারফত খবরাখবর হবে।"

যুগলবাবু হাসলেন। মনে ভাবলেন "আচ্ছা পাগল তো! জ্ঞানের নাড়ী টনটনে।"

১৯২০ সালে সকলের সাথে মুক্তি পেয়ে পাগলা সাধুও এলেন বাহিরে। দেশে তখন আগুন লেগে গেছে। অমৃতসরের হত্যালীলার প্রতিবাদে ভারতের অন্তরাত্মা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। দলে দলে নরনারী অস্বীকার করছে ইংরাজের অধিকার। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে—"ধ্বংস হোক সাম্রাজ্যবাদ,—মানিনা ইংরাজের অধিকার।" নরেনবাবু, প্রতুলবাবু, রবি সেন, প্রভাস লাহিড়ী, আশু কাহিলী প্রভৃতি দলপতিরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। নরেন বাবু ভারী খুশী। বলেন "জেলে সক্কলে আমারে পাগল বানাইছিল। অখন গ্যাখ আমি ঠিক কইছিলাম কি না।"

সমিতির ছোট বড কর্মী প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। দিলেন না শুধু পুলিন বাবু। তিনি অহিংস আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। নরেন বাবু, প্রতুল বাবু প্রভৃতিকে ডেকে তিনি বললেন—"তোমরা

অসহযোগে মাতছ দেখত্যাছি। কিন্তু তোমাগো উদ্দেশ্য বিপ্লব না? হের তবে কি চাই তাও তোমাগো অজানা নাই। অস্ত্র, অর্থ, আর বাছা বাছা কর্মী আমাগো যোগাড় করতেই হইব। সে কাজ যে পথে হইব সেই পথ আপাতদৃষ্টিতে নীতিবিরুদ্ধ হইলেও আমাগো নীতিতে আটকায় না। আমি ঠিক করছি অসহযোগ নয়—সম্পূর্ণ সহযোগ করুম্—গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে টাকা লমু।”

নরেন বাবু বললেন—“কিন্তু জনসাধারণ আমাগো উপর বিশ্বাস হারাইব। দেশ জাইগ্‌গা উঠছে—এতে বাধা দেওন উচিত নয়। আমার মতে বিপ্লবের পথে এ নীতি—দুর্নীতি।”

পুলিন বাবু কোন দিনই প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। শ্লেষের সাথে বললেন “ডাকাতি কোন সুনীতি ছিল তোমাগো? ভুল,—নরেন! ভুল। লোকের বাহবা, হাততালি, ফুলের মালা তোমাগো পাইয়া বইছে। সর্বদা খেয়াল রাখবা বিপ্লবীর লক্ষ্য—শেষলক্ষ্য। বিপ্লবীর নীতি—End justifies the means. আজ যদি দ্যাশের সব লোকও আমারে দেশদ্রোহী মনে করে,—কুছ পরোয়া নাই—যদি আমি স্থির জানি আমার পন্থায় আমি লক্ষ্যে পৌছামু। আমার ত্যাগের দিনের আত্মদান—সব অপবাদরে ম্লান কইরা দিব গিয়া, আমার ত্যাগের পরিচয় দ্যাশে বিস্ময় আনব,—আমার ত্যাগের আঘাত স্তম্ভিত কইরা দিব দ্যাশবাসীরে। যারা অখন আমাগো শাপা কইব তারাই হেদিন মালা দিব।”

আর কেউ প্রতিবাদ করল না। পুলিন বাবুর নেতৃত্বে “ভারত সেবক সঙ্ঘ” স্থাপিত হল। দলের অন্যতম নায়ক কৃতী লেখক শ্রীনলিনী কিশোর গুহের শক্তিশালী লেখনী প্রসূত অসহযোগের বিরুদ্ধে বেনামী প্রচারপত্র “হক্ কথা” দেশে প্রভূত বিস্ময়ের সঞ্চার করল। এ ধরণের যুক্তি তর্ক দিয়ে রাজনৈতিক আলোচনামূলক ইস্তাহার আগে আর দেখা

যায়নি। প্রথম প্রথম কেউ ধারণাই করতে পারেনি কোথায় "হককথার" জন্ম। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল পরে সন্ধান পেল "ভারত সেবক সঙ্ঘের" বেনামীতে অনুশীলন সমিতিই এটা চালাচ্ছে। দেশবন্ধু দাশের কাণেও পৌছাল এ কথা। আরও তিনি খবর পেলেন তাঁর কল্পিত "হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের" বিরুদ্ধেও অনুশীলন সমিতি।

১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে দেশবন্ধু অনুশীলনের নেতাদের আহ্বান করলেন। দলের পক্ষ থেকে শ্রীআশুতোষ কাহিলী গেলেন তাঁর কাছে। সুরু হল ঝগড়া। দেশবন্ধু উত্তেজিত স্বরে বললেন "তোমরা দেশদ্রোহী। তোমরা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছো,—তোমরা সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়ে মীরজাফরী অভিনয় সুরু কোরেছো,—তোমরা আমার প্যাক্টের বিপক্ষে ক্যানভাস্ কোরছো।" আশুবাবু বললেন—"শ্যাষ্ হইছে আপনার কথা? এই-বারে আমি কই। প্রথমেই একটা কথার প্রতিবাদ করি। আমরা সরকারের কাছ হইতে টাকা লই,—খাইনা। এই হ্যাখেন গায়ে জামা নাই—পেটে ভাত নাই।" একটু থেমে আবার সুরু করলেন—"হঃ—টাকা আমরা লইছি কারণ আপনারা আমাগো উদ্দেশ্যে জাইন্যাও আমাগো একপয়সা সাহায্য করেন নাই। হ্যাশের নেতারা তাগো উপরে উঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করিতে চায় আমাগো। নাগপুরে যখন লাঠি চলছিল আপনার মাথার উপর তখন আমাগো আদর ছিল আপনার কাছে। অখন আপনাগো চাই ফুলের মালা। তাই মালীগো আদর হইছে। আমরা যা' ছিলাম তাই আছি। আগে টাকার লাইগা ডাকাতি করতাম,—অখন ভাঁওতা দিয়া গবর্ণমেন্টের কাছে টাকা লই। কংগ্রেসের টাকা লইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওনের চাইতে,—সরকারের টাকা লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে যাওন ঢের ভাল বইলা বুঝি।"

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দেশবন্ধু।

"গবর্ণমেণ্ট বেকুব? তোমাদেব উদ্দেশ্য জানেনা,—না? কেন তোমাদের টাকা দেয়?"

"তাগো সুবিধাব জন্য"—উত্তব দেন আশুবাবু। "আমাগো সুবিধার জন্য আমরা টাকা লই। সবকাব ভাবছে আমাগো দিয়া অসহযোগবে শ্যাষ কইবা আমাগো শ্যাষ কোবব। তাই আমাগো হাতে টাকা দেয়,—পাছে স্পাই লাগায়। আমবা জানি দ্যাশ জাগত্যাছে। আমবা—বিপ্লবীবা যদি আজ প্রস্তুত না হই, মিথ্যাই হইব এ জাগবণ। কাবণ জনগণ যাইব আগাইযা, আজেব নেতাবা পডব পিছাইযা। আব আপনার প্যাক্ট?"—একগাল হেসে আশুবাবু বললেন—"আপনাবে মানি, আপনাব ত্যাগবে মানি, আপনাব পার্লামেণ্টাবি প্রতিভাবে মানি—কিন্তু আপনার প্যাক্টবে মানিনা। প্যাক্টে কি স্বাধীনতা আইব? কনতো কি করুম আমবা প্যাক্ট দিযা। আপনাব প্যাক্টে মিনিষ্ট্রিব বদবদল হইতে পাবে, কর্পোবেশন দখল হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমাবে মাফ্ কববেন—আমি চললাম।"

দেশবন্ধুকে নমস্কাব কবে আশুবাবু চলে এলেন।

ঠিক এই সময়েই সিবাজগঞ্জেব একজন সভ্য—নবেন ভট্টচাযেব—গৃহে বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল থেকে বিপ্লবীবা সমবেত হযেছেন! কিছু-দিন আগেই নরেন সেন, ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, বমেশবাবু প্রভৃতি অনেকেই ফেবারী হয়েছেন। বিপ্লবীদেব এই মিলনীতে নবেনবাবু বলছেন—"অসহযোগ আন্দোলনেব চূডান্ত পবিণতি হয আপোষ বফা—নয—হিংসাত্মক বিপ্লব। যাঁবা আজ এই আন্দোলনেব নাযক তাগো দিয়া বিপ্লবেব আশা কবিনা আমবা—অসহযোগ আন্দোলনেব বৈপ্লবিক অংশ-টুকু আমাগো গ্রহণ কবতে হইব। জনগণের উত্তেজনা উন্মাদনারে বৈপ্লবিকরূপ দিতে হইব! তাব জন্য চাই জোব প্রস্তুতি। আমবা যদি জন চেতনাবে—এই টাইম ফোর্সবে কাজে লাগাইতে না পাবি—

বিপ্লবী হিসাবে ব্যর্থ হমু আমরা,—অযোগ্য প্রমাণিত হমু আমরা। জোয়ার আইয়া ফিইব্যা যাইব ব্যর্থতার ছাপ বাইক্ষ্যা।"

আশুবাবু এসে দেশবন্ধুর সাথে তর্কাতর্কির সবিস্তাব বিবরণ দিলেন। নরেনবাবু বললেন, "ইসে ঠিকই কইছো তুমি। কিন্তু জবাবটা বড়ই ঠোঁটকাটা হইছে। আমাদেব সম্পর্কে অবিচাব কবলেও দেশবন্ধু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আমাগো তবে করছেনও ঢেব। সক্কলের উপরে হইত্যাছে—তাঁর সবল নেতৃত্বে বাংলা জাগ্‌ছে। তাঁব নীতি আমবা না লইতে পারি—তাঁরে অশ্রদ্ধা কবতে পাবি না।"

ঠিক এই সময়েই পূর্ববঙ্গের জনৈক কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধুকে বলছেন—"এতবড স্পর্দ্ধা ওগো—আপনার লগে ঝগডা করে—আপনারে শুনায় কথা—ঝাল ঝাড়ে! হুকুম গ্যান্—ওগো পিষ্‌ষ্যা মারুম্ আমরা।"

জবাবে দেশবন্ধু বললেন—"এটা কি বলেন আপনি! আমি যে ওদেব বেশ কবে জানি। ওরা দধীচি আব সব্যসাচির Combination. আমি জানি বহু চোব বদমাইস্ আমাকে ঘিবে বসে আছে—আমাব দল ভাবী কোবেছে। আর ওবা জনে জনে নিষ্কলুষ খাঁটী সোণা। যাবা প্রাণটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—নিজেদের ভুলভ্রান্তি ছাড়া তাদের পিষে মাবতে কেউ পারে না। আমবা ওদেব নীতির সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু ওদের অশ্রদ্ধা কোরতে পারি না।"

প্রাদেশিক বাজনৈতিক সম্মেলনেব অন্তরালে এই বকম একটা বিপ্লবী মিলনীব আশঙ্কা পুলিশ করেছিল। সন্ধানও তারা পেয়েছিল! কিন্তু বিপ্লবীরাও পুলিশের কৃপাদৃষ্টিব হাওযা পেয়েই সরে পল। নরেনদা লাহিড়ীমোহনপুরে (পাবনা জিলা) মণীন্দ্র ওরফে জল্লেশ লাহিড়ীদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সেখানেই অবশিষ্ট আলোচনাটুকু সেরে তিনি জিতেশ লাহিড়ীর সাথে সাথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছেন। মাঠে একটী ক্ষেতে প্রায় ষাট-সত্তব জন কৃষক ধানের জমি নিড়াচ্ছে।

হিন্দু মুসলমান দুইই আছে। নরেনদা জিজ্ঞেস্ করলেন "এতলোক একখান ভুঁইয়ে ক্যান্ জমা হইছে ?"

জিতেশ বললে—"গাঁতা করে কাজ করছে। গ্রামের সমস্ত চাষী—হিন্দু মুসলমান—নির্বিশেষে—আজ একজনের, কাল অপরের—এইভাবে সকলের জমিই নিড়িয়ে দেবে।"

"অর্থাৎ সমবায় প্রথায় ক্ষেতের কাজ। সকলে মিইলা সকলের কাজ করে। উৎপন্ন ফসলের বণ্টনটাও যদি এই নীতিতে হয তা হইলে চমৎকার হয়।"

গাছে গাছে আমজাম পেকে আছে। গাছের তলায়ও প্রচুর পড়েছে। নরেনদা প্রশ্ন কোরলেন—"এই সব আমের গাছ কাগো ?"

"গ্রামের লোকদের।"—জবাব দেয় জিতেশ।

—"কোন পাহারা রাখে না ?"

—"না"

—"কেউ পাড়ে না—চুরি করে না ?"

—"প্রত্যেকেরই এত আছে যে চুরি করার দরকার হয় না।"

নরেনদা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন—"দেখ্ছ—দেখ্ছ! সাপ্লাই যদি ডিমান্ডরে অতিক্রম করে—অর্থাৎ অভাবে না থাকে—তা হইলে সামাজিক অপরাধ লোপ পায়। সাধারণের জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনের মান বাইখ্খ্যা যদি প্রোডাকশানরে বাড়ান যায় তবেই তো সেডা শান্তিপূর্ণ সুখের রাজ্য হইতে পারে। অভাবও নাই—বাহুল্যও নাই।" কিছুক্ষণ নীরবেই পথ চললেন নরেনদা। জিতেশ যায় আগে আগে—নরেনদা পিছে। হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন—"জান জিতেশ! নূতন একটা ভাবের বন্যা আইত্যাছে পৃথিবী জুইড়্যা। এই বন্যায়—এই নীতিতে দুনিয়া ভাইস্যা যাইব গিয়া। আমাগো এই সমাজ ভাইঙ্গ্যা চুইর্যা নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইব। এই নীতির

Experiment চলত্যাছে কশস্থাশে। তাই Study করণের লাইগ্যা গোপেনরে পাঠাইছি সেখানে। দেখি সে আমাগো লাইগ্যা কি আনে—আগুন-না-ছাই।"

কিছুদিনেব মধ্যেই নরেনদা ধবা পড়ে জেলে গেলেন। এবারে পুরো-পুবি পাগল তিনি। মলমূত্রের বিচাব নাই। নির্বিকারে পড়ে থাকেন তারই মধ্যে। সি, আই, ডিবা কাছে এলে ভিরমি লাগে। কেবলমাত্র ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি আর দু'চার জনেব সাথে ফিস্‌ফাস্‌ আলাপ করেন। কেউ প্রশ্ন কবলে বলেন, "যাদুবাবু সাধন পথে অনেকদুর আগাইছেন,—বিশ্বনাথ (মুখার্জি), যতীন (দাস), আশু—এরাও সাধন ভজনেব লোক।"

একদিন প্রাতে নবেনদা বেজায বমি কবতে লাগলেন। বাজবন্দী সাথী ভাই আব জেল কর্মচারীবা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পলেন। ছুটে এলেন জেলাব, ডাক্তাব। নবেনদা হাসেন আব বলেন—"আরে তামাসা ছাথ্! কি হইছে আমার?—কিচ্ছুনা। এডা হইত্যাছে Sea-Sickness জাহাজে চডছি—সি, আই, ডি অক্ষয় রইছে আমাব লগে,—জাহাজেব দোলায় গায় মোচ্চড় ছায়—বমি আহে। ওষুদপত্তর লাগবনা,—ওষুদে কিচ্ছুই হইত না।"

সকলেই ভাবল এ পাগলামি। কিন্তু দুইদিন পবেই সি, আই, ডি শ্রীঅক্ষয় দত্ত পরোয়ানা নিয়ে জেলগেটে হাজিব হন। নরেনবাবুকে যেতে হবে ব্রহ্মদেশেব জেলে—রেঙ্গুনে। জেল কর্মচাবীরা অবাক। ভেবেই পায়না তারা নবেনবাবু পাগল—না—অলৌকিক শক্তিশালী সত্যদ্রষ্টা।

* * * * * *

১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়ে নরেনদা বামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন। একেবাবে সাধুমহাবাজ। দলের লোকজন তাঁর কাছে গেলেই বলেন "তোমরা ধর্মচ্যুত হইছ—তোমাগো দল টিকব না,—নীতিরে হারাইয়া রাজনীতি হয় না। বিপ্লবীর ধর্ম হইল গিয়া বিপ্লবের লাইগ্‌গ্যা ছট্-

ফটানি। সেই ভাবতো তোমাগো ভিতর দেখি না। তাই তোমাগো বাজনীতি ইলেক্‌শান্‌-নীতিতে নামছে।"

আগেই গোপেন চক্রবর্তী ফিরে এসেছে রুশদেশ থেকে ষোলআনা কম্যুনিষ্ট হয়ে। ইংলণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির মারফতে রুশদেশেব সাথে যোগাযোগের প্রস্তাব এনেছে সে। দলপতিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন নরেনমহারাজের কাছে, খুলে বললেন সব কথা। সাধুমহাবাজ নীরবে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বসে রইলেন। তারপব বললেন—"তোমরা তো চিনির স্বরূপ জানতে চাইছিলা,—মনে ধরলে চিনিই হইতে চাইছিলা। কদমা বাতাসা তো হইতে চাও নাই। তোমবা লইবা বিপ্লবেব নীতি,—কোন বিপ্লব দলের লেজুর হইবা ক্যান্‌।"

ফিরে এলেন সকলে।

এব পব বহুদিন নবেনমহাবাজেব পাত্তা নাই। তিনি মিশনের আলমোড়া, কাশী, বাঁচি আশ্রমে থাকেন। কোন যোগাযোগ নাই দলের সাথে।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছে। বিপ্লবীবা দলে দলে ধবা পড়ছে। সুভাষবাবু উধাও হয়েছেন দেশ থেকে। জাপানীবা আক্রমণ কবে দখল করেছে মালয়, সিঙ্গাপুর—আক্রমণ কবেছে ব্রহ্মদেশ। ইংরাজরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার চালিয়েছে জাপানী বর্বরতাব কাহিনী ;—আর তাবই পোঁ ধবে একদল মোহাবিষ্ট যুবক পথে পথে টইল মেরে শ্লোগান দিচ্ছে "জাপানকে রুখ্‌তে হবে—জাপানকে রুখ্‌তে হবে।" কিন্তু তাদের পিছে পিছেই ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী নরেন মহাবাজ ছুটে বেড়ান ঢাকা সহবের পথে পথে—আর পরিচিত কর্মী দেখলেই বলেন—"তোমরা ওঠো—তোমরা জাগো! ইংরাজের চর গো কথা তোমরা শুনোনা। আমি সাধু, আমি কইত্যাছি জাপানীগো লগে লগে সিঙ্গাপুরে আইছে আমাগো রাসবিহারী বোস্‌—গইড়া তুলছে ভারতের

মুক্তি ফৌজ ! আমি দেখত্যাছি সে ফৌজেবও নেতৃত্ব লইব আমাগো সুভাষ-নেতাজী সুভাষ—আর এখানে—ভারতের জনতা—ভারতের অন্তরাত্মা—গর্জন কইবা উঠব দাসত্ব মোচনে,—লাখে লাখে মাইত্তা উঠব বিপ্লব অভিযানে ;—তোমরা প্রস্তুত হও—তোমবা প্রস্তুত হও—"

এই পাগলা সাধুব মরমী আহ্বান দেশবাসীব কনে গেল না—কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগেব কাণে গেল। পাগলের প্রলাপ বলে দেশবাসী সে আহ্বান উপেক্ষা করলেও সবকার উপেক্ষা করল না। কেউ সাড়া না দিলেও আই, বি সাড়া দিল। ১৯৪২ সালের আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে তাবা গ্রেপ্তার কবে নরেন মহাবাজকে নিয়ে এল জেল গেটে। খবর পেয়েই অবরুদ্ধ রাজবন্দীরা ভিড জমাল গেটের কাছে ! দেখল তাবা নবেন মহারাজ বেগে কাঁই হয়েছেন। ক্রুদ্ধস্বরে সি, আই, ডি আব জেল কর্ম্মচারীদের সম্বোধন করে ইংবাজের উদ্দেশ্যে বলছেন—"সাধুব গায় হাত দিছে ইংরাজ,—ধ্বংস হইব তাগো রাজত্ব। মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসের নেতাগো গ্রেপ্তাব কইবা মূর্খ ইংরাজ ভাবছে গ্রেপ্তার করছে বিপ্লবরে। কিন্তু ইসে ঠিক জানবা ভারতের জনতাই বাজাইব বিপ্লবের বিষাণ,—আর ভারতে পূর্ব্ব সীমানায় নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে উডব স্বাধীন ভারতের বিজয়-নিশান। অথন বেলা পাঁচডা। আমি দিব্যচক্ষে দেখত্যাছি আজ হইতে পাঁচ বছরের মধ্যে ইংরাজের রাজত্ব শ্যাষ হইব। সূর্য যদি পশ্চিমেও উঠে আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। ইসে সাধুর অভিশাপ—ভারতের মর্মবেদনা,—বিপ্লবীব আজীবন নিষ্কাম তপস্যালব্ধ দিব্য-দৃষ্টি।"

বদলী

ভারতের এক হতাশাময় অন্ধকার যুগে একদল তরুণ দেশপ্রেমের হোমাগ্নিতে আত্মবিসর্জন করে দিকে দিকে মুক্তির আগুন জ্বালতে চেয়েছিল। জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে সেই যুগটা 'অগ্নিযুগ' নামে পরিচিত। এই যুগে একদিকে যেমন বহু সুশিক্ষিত মেধাবী কর্মীর নিরক্ষরের ছদ্মবেশে বিপ্লবায়োজনে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে,—অন্যদিকে তেমনি বহু অল্পশিক্ষিত কর্মী—দেশপ্রেমের দমকা হাওয়ায় যাদের পাঠ্যজীবনের আলো নিভে গিয়েছে—তাদেরও পণ্ডিতের ভূমিকা অভিনয় করতে হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষে অশিক্ষিতের ভূমিকা অভিনয় করা কিছুটা সহজ সাধ্য হলেও অল্পশিক্ষিতের পক্ষে পণ্ডিতের ভূমিকায় মানিয়ে চলা কতটা ভয়ঙ্কর সেই কথাই বলছি!

১৯১৩ সালে বিপ্লবসমিতির উত্তরবঙ্গের নায়ক বিরজাবাবু (মহারাজ) ধরণীকে আদেশ দিলেন "জেলার অর্গানিজেশনের ভার লইয়া তোমারে যাইতে হইব মালদহ।"

প্রতিবাদের ক্ষেত্র নাই। নেতৃমণ্ডল থেকে যে আদেশই আসুক না কেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। ধরণী শুধু জানতে চাইল "সেখানে কিছুটা আছে তো?"

—"মনে কর নাই। সব তোমারেই গড়তে হইব।"

—"আমার থাকনের কি ব্যবস্থা হইব?"—ধরণী প্রশ্ন করলে।

—বিরজাবাবু উত্তর দিলেন—সেডা তুমি পাইবা। একটা পোলার নামে একখানা Introduction letter দিত্যাছি তোমারে। সেই তোমার থাকনের সব ব্যবস্থা কইরা দিব। ছয়মাস পর আমি যামু সেখানে। কদ্দূর আগাইছ দেখমু গিয়া।"

বিরজা বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ধরণী মালদহ রওনা হল। কাটিহার হয়ে চলেছে ট্রেনে। গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল তার।

মাঝের একটা ষ্টেশন থেকে তিনি ট্রেনে চেপেছেন। বাক্স, বিছানা, পোঁটলা, পুঁটুলী নিয়ে যতটা না বিব্রত হয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী বিব্রত হয়েছেন জীবন্ত পুঁটুলী বিশেষ বউ ঝিদের নিয়ে।

আধুনিকা মা লক্ষ্মীরা রাগ করবেন না,—এটা ছত্রিশ বছর আগেকার কাহিনী। সে দিনের মা লক্ষ্মীরা অচলা অবলাই ছিলেন,—প্রগতির পরশে আজের মত— সচলা, হরবোলা হয়ে উঠেননি। স্বামীর নাম ধরে ডাকা তো দূরের কথা নামের আদ্যক্ষর উচ্চারণ করলেই সে দিনের মেয়েরা আৎকে উঠে জিভে কামড় খেত।

ধরণী ভদ্রলোককে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সুতরাং মুহূর্তেই সে তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠল। ভদ্রলোক বললেন "খুব করেছ বাবা।"—কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর।

—"হুঁ—তোমার নাম? যাবে কোথায়? কি কর?"

ধরণী কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল "কি আর করেছি। এতো সাধারণ কর্ত্তব্য।"

—"আরে—আজকালকার দিনে সাধারণ কর্তব্য করতে যে এগিয়ে আসে—সে তো অসাধারণ। যাক্—তোমার নাম?"—জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

"আমার নাম শ্রীধরণী ধর রায়,—আমি যাইতাম মালদহে—

—"বেশ—বেশ! কি কর তুমি?—

—"আইগ্যা—মালদহ কলেজে আই, এ পড়ি।" ধরনী উত্তর দিল।

—মালদহ কলেজ! "বিস্মিত ভাবে ভদ্রলোক ধরণীর মুখের দিকে চাহিলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—"মালদহে তো কোন কলেজ নাই।"

ধরণী থতমত খেয়ে বললে—"আইগ্যা কলেজিয়েট স্কুল।"

—"কলেজই নাই.—তার আবার কলেজিয়েট স্কুল!" ভ্রুকুঞ্চিত

করলেন ভদ্রলোক। সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন—"কি কি Subject নিয়েছ।"

—"সমস্কৃত, এরিথমেটিক, সায়েন্স"—চটপট জবাব দিল ধরণী।

ভদ্রলোকটির মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। স্বর যথাসম্ভব নীচু করে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কোন দলের?"

ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আশ্বাস দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"কিছু ভয় নাই আমার কাছে। বুঝতে পেরেছি। তুমি এনার্কিষ্ট পার্টির লোক। আমি রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টার কিনা। তোমার পরোপকারের মনোবৃত্তি, আবোল তাবোল জবাব আর ঢাকাই কথা থেকেই বুঝেছি তুমি স্বদেশী দলের ফেরারী।"

ধরণী যেন কি বলতে যাচ্ছিল। মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বললেন—"উঁহু—কোন কথা না—আমার কথা আগে শোনই। আমি বুঝেছি তুমি স্কুল কলেজে পড়নি। বোধহয় অবসর পাওনি। কিন্তু ছাত্র হিসাবে কেন পরিচয় দিতে চাও? ব্যবসায়ী বা জমিদারের চাকরী কর, বাজার সরকার, শিক্ষানবীশ—নিদেন ভবঘুরে—কোন কিছুই করনা—যা হোক কিছু বললেই তো চলে। ভবিষ্যতে সতর্ক না হলে বিপদে পড়বে।"

ধরণী একদম বেকুব বনে গেল। তার আড়ষ্ট ভাব কাটানোর জন্যে এক ষ্টেশনে ভদ্রলোক বললেন—"এক ঘটী জল আন না বাবা।" ধরনী হাতে স্বর্গ পেল।

মালদহ ষ্টেশনে ভদ্রলোকের পায়ের ধূলো নিয়ে ধরণী নেমে গেল।

গেট দিয়ে বেরুতেই সে দেখতে পেল একটী যুবক হলদে রংয়ের একখানি রুমাল নাড়াচাড়া করছে। ধরণীও পকেট থেকে নীল রুমাল বের করল। এই ছিল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ষ্টেশন হাতা থেকে। একটু দূরে এসে ধরনী সাথীকে প্রশ্ন করলে—"আপনারে কি নামে ডাকুম?"

—"হংস"—উত্তর দিল সাথী।

—"হংস, রাজ না পাতি?"—ধরণীর চোখে মুখে কৌতুক উপচে পড়ে।

—"রাজ—পাতি কিছুই না,—একেবারে পরম"—মৃদু হেসে জবাব দেয় সাথী। একটু থেমে আবার বললে—"আমি সত্যিই হংস। তবে ডানাওয়ালা না—আগরওয়ালা। আমার নাম হংসগোপাল আগরওয়ালা। এখানেই বাড়ী।"

—"ঠোকা মারবেন না তো?"—রহস্য করে ধরণী।

—"বোকা হলেই ঠোকা খেতে হবে"—হেসে জবাব দেয় হংস।

—"তবে জেলার লীডারশিপের লাঠি হাতে আছে—তাড়া লাগাবেন —হংসের বংশও কাছে ঘেঁষবে না।"

পরদিন হংস ধরণীকে এক উকিল বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললে—"রামগোপাল কাকা! এই যে আপনার খোকার মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এসেছি!"

মাষ্টার মশাই! বলে কি। ধরণীর মাথার মধ্যে রীতিমত কামারশাল,—ঠন্ ঠন্ বেদম হাতুড়ি চলছে। তার মনে হল লীডারশিপের লাঠি হাতে নেবার আগেই বিশ্বাসঘাতক হংস অতর্কিতে ঠোকা মেরেছে। মনে মনে বিরজা বাবুর উপর বিষম বিরূপতা আর হংসের ঠোটকর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে অসহায় অবস্থার চাপে ধরণী অগত্যা রামগোপাল বাবুর খোকার মাষ্টার মশাই হয়ে গেল।

বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী সে। খুন, ডাকাতি, বোমা তৈরী প্রভৃতি বহু বিপজ্জনক কর্মে সে লিপ্ত হয়েছে, অন্ততঃ আট দশবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অকুতোভয়ে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কর্মে সে ইতঃপূর্বে হাত দেয় নাই। তার মনে হল সশস্ত্র সেপাই,—পুলিশ, মিলিটারী—ভীষণদর্শন গোরা সার্জেণ্ট,—বসন্ত চাটুয্যে, টেগার্ট, ডেনহাম, লোম্যান, কলসন,—এমন কি স্বয়ং কৃতান্ত অপেক্ষাও সমধিক

ভয়ঙ্কর এই আট নয় বছরের প্রিয়দর্শন খোকাটী। এ যেন মায়াবী শিশু! এর কম-কান্তির অন্তরালে ভীষণ দর্শন, হিংস্র, শস্ত্রপাণি দৈত্য ধরণীর ধ্বংসের তরে আত্মগোপন করে আছে। হাসি, খেলাধূলা, মিষ্টি কথা—সব মায়া—সব ছলনা। বই-এর দপ্তর এই মায়াবী দৈত্যের তূনীর। তা'তে রক্ষিত অগ্নি, সর্প, ক্ষুরূপা, বৈষ্ণব, ব্রহ্মশির প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ প্রাণঘাতী শরনিচয়কে মায়াবলে সাহিত্যচয়ন, ব্যাকরণ, পাটীগণিত, কিং রীডার প্রভৃতি সহজ মোলায়েম, মনোহর রূপ দেয়া হয়েছে। সব চেয়ে সাংঘাতিক কিং রীডার। একেবারে সর্পবাণ। জ্যা-মুক্তির সাথে সাথেই শত সহস্র নাগ-নাগিনী ফণামেলে কিল্‌বিল্‌ করে তেড়ে আসে। ছেলেটী ও তার দপ্তরের দিকে ধরণী চেয়ে চেয়ে দেখে আর আতঙ্কে শিউরে উঠে। মাঝে মাঝে তার ভারী রাগ হয় কবিদের উপর—যারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে প্রভাত ও সন্ধ্যাকে স্তবস্তুতি করে স্বর্গে তুলেছে। দিবসের যে যে অংশে মায়াবী দৈত্যের আক্রমণ প্রখর হয়—তার রূপ নাকি অতীব মনোহর। যত সব ভণ্ডের দল! আর রাগ হয় বিরজাবাবুর উপর,—যিনি ধরণীকে বর্তমান ফ্যাসাদে ফেলেছেন। চার পাঁচ দিন পর পর সে তাঁকে নিয়মিত ভাবে পত্র লিখে প্রার্থনা জানায়—আমাকে বদলী করুন। বিরজা বাবুর কাছ থেকে জবাবও নিয়মিতই আসে—তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। ধরণী নিরাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে,—আর মনে মনে বলে—একেবারে পাষাণহৃদয় বিরজা বাবু,—খুনী, ডাকাতগো সর্দার কিনা!

অনেক ভেবে চিন্তে মায়াবী শিশুর মায়াজাল থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে ধরণী মহামায়ার শরণ নিল। বাড়ীর কর্ত্রীকে সে মা বলে ডাকতে লাগ্‌ল। মা'র মুখ থেকে কথা বেরুতে পায় না। কিছু বলতে না বলতেই সুসন্তান ধরণী তড়াক করে তা' সম্পন্ন করে। ফলে মা'র

মুখে ধরণীর সুখ্যাতি আর ধরে না। বড়ই ভাল ছেলেটী! আহা! বাছার 'মা' ডাক কত মিষ্টি।

কিন্তু একদা মায়াবী শিশুর ভীষণ আক্রমণে পরাজিত, পর্যুদস্ত হয়ে ধরণী মরমে মরে গেল।

রবিবার। খোকা বৈঠকখানায় বাবার সামনেই পড়তে বসেছে। ধরণী পড়াচ্ছে কিং-বিডার। ম্যাট্ মানে মাদুর ঠিকই হ'ল। কিন্তু বিপদ এল প্যাট্ আর ভ্যাট্ নিয়ে। অনেক গবেষণা করে ধরণী বুঝালে—"প্যাট্—প্যাট্,—প্যাট্ মানে জান না? কি কই তোমারে। প্যাট্ মানে ইসে (ধরণী হাত দিযে নিজের পেট নাড়লে) যারে কই উদর। আর ভ্যাট্ মানে—কি কমু—ভ্যাট্ মানে ডালি। ডালি দ্যাওনের কথা শুন নাই? ডালি ইসে জজ ম্যাজিষ্টর গো যা দেয় কাম বাগাইন্যার লাইগ্যা—ঘুস্—ঘুস্।

হঠাৎ রামগোপাল বাবু খোকার দিকে যোগ দিলেন। ভ্রূকুঁচিয়ে বললেন—"উঁহু—হ'ল না। খোকা! প্যাট্ মানে আদর করা,—ভ্যাট্ মানে জালা—জলের ট্যাঙ্ক জাতীয় বড় আধার।"

আবার এল ক্রাই, ট্রাই, ফ্রাই। প্রথম দুটোর মানে ঠিক ঠিক হ'ল। কিন্তু ফ্রাই নিয়েই ধরণী ড্রাই হয়ে গেল। সে কেবলই আওড়ায়—ফ্রাই মানে—ফ্রাই মানে,—আর ঢোক গিলে। অবশেষে রামগোপাল বাবু বলে দিলেন—ভাজা—ভাজা।

ধরণী মনে মনে বলে—হায় ভাজা! আজ তুমি তাজা মানুষডারে ভাজলা দেখত্যাছি!

অবস্থা দেখে রামগোপাল বাবু বললেন—খোকা। পড়া এখন থাক্। বিকেলে মাষ্টার মশায়ের সা.থ বেড়িয়ে এসে পরে পোড়ো।

ধরণীর মনে হ'ল ফাঁসির আসামী King's Pardon পেয়েছে। উঃ—কি দয়ার শরীর রামগোপাল বাবুর,—একেবারে দয়ার সাগর—

বিত্তাসাগর! বাছুরের কষ্ট দেখে দুধ খাওয়া ছাড়লেই বেঁচে যাই!

আবার বিরজা বাবুর কাছে পত্র গেল—বদলী চাই। কিন্তু একই উত্তর বিরজাবাবুর—নডচড় নাই।

পাটীগণিতেও ইংরেজীর অবস্থা। খোকাটা খুলে বসেছে ল-সা-গু, গ-সা-গু! সাগুকে ধরণী চিরকাল ভয় করে। জ্বর জ্বালা হ'লে সাত দিন উপোস্ ঠুকে প'ড়ে থাকে,—সাগুর ধারে কাছে যায় না। কিন্তু পাটীগাণতের সাগু যে আরও ভয়ঙ্কর! পুনশ্চ বদলীর প্রার্থনা।

দয়ামর রামগোপাল বাবু সব অবস্থা বুঝে খোকার পড়ানো থেকে ধরণীকে রেহাই দিলেন। সে এখন কর্ত্রীমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। হাট-বাজার করে, খোকাকে নিয়ে বেড়ায়, ঘবকন্নার অনেক বিষয় তদারক করে।

অথণ্ড অবসব পেয়ে এবাবে সে অর্গানিজেশনে মন দিয়েছে। বিত্তা বিশেষ না থাকলেও লোকজনেব সাথে মেলা মেশাব একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে তাব। তাবই জোরে একটী দুটী কবে প্রথমে শহরে—পবে গ্রামাঞ্চলেও অর্গানিজেশন বিস্তার কবল সে। সফলতায় এল তন্ময়তা। ধরণী ডুবে গেল বৈপ্লবিক সংস্থা সংগঠনে।

সৃষ্টিতে আনন্দ আছে। আর সে সৃষ্টি যদি অসাধ্য সাধন হয় তার আনন্দের পারাপার নাই। যতই অর্গানিজেশন বিস্তার লাভ করে—ততই ধরণীব আনন্দের পরিধি বাড়ে। অবশেষে ধরণীর সৃষ্টি তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করল। তাব নিজস্ব সত্বা এক হ'য়ে গেল অর্গানিজেশনের সাথে।

হঠাৎ একদিন বিরজা বাবু এসে হাজির হলেন। ধরণীর হাতে, গড়া অর্গানিজেশন দেখে চমৎকৃত হলেন তিনি। প্রশংসা করে বললেন—"বাঃ—পূর্ণ! বেশ করছ তুমি।"

পূর্ণ ডাক শুনে চমকে উঠল ধরণী। মনে হ'ল সেটা তার পূর্ব

জন্মেব নাম। পূর্ণ ডাকেব সাথে সাথেই যেন জাতিস্মর বিহঙ্গমের স্মরণে উদিত হ'ল পূর্ব জন্মেব স্মৃতি। পূর্ণ চক্রবর্তী---নামে একটী বালক ছিল। আত্মীয়স্বজন সকলেই ডাকত তাকে 'পুনা' নামে। বাবা মা আদর কবে ডাকতেন 'পূর্ণ'। বিমূঢ়েব মত সে বিরজা বাবুর দিকে বাব বার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল। একি মাতা ?—একি পিতা ? পূর্ণ ডাকেব মাঝ দিযে বাল্যেব সেই স্নেহময় আহ্বান ভেসে আসে তার কাণে। তাব পবেই তাব মনে হল পূর্ণ—বালক পূর্ণ চক্রবর্তী মবে গিয়ে বৈপ্লবিক নবজন্ম গ্রহণ করেছে। এ জন্মে নাম ধরণী বায়। এখন সে মালদহেব ধবণী—আব তাব সম্মুখে মাতা নয়, পিতা নয়,—নাযক—অথবা তিনেরই সমন্বয়।

বাতে খেয়ে দেয়ে শোবার আগে বিবজা বাবু বললেন—হ—তুমি না বদলী চাইছিলা ?

বদলী ? চমকে উঠল ধরণী।

—হ্যাঁ—না—তা ইসে তখন যখন হইলই না—অখন আব দরকার নাই—সঙ্কোচেব সাথে বলে ধরণী।

—এডা কি কও ? তোমার বদলী যে মঞ্জুর হইছে! তোমারে যাইত হইব ত্রিপুরায়—বললেন বিরজা বাবু।

—না—না—আমি এখানেই থাকি—অখন সব ঠিক হইয়া গেছে গিয়া,—আবার বলে ধবণী।

—"তাই তো তোমারে যাইতেই হইব। ত্রিপুরায় ভাল লোক চাই"—বিবজা বাবু জোর দিয়ে বলেন।

পূর্ণর মন বিষাদে ভরে গেল। ক্ষোভে, দুঃখে সে মনে মনে বললে—"যখন বদলী চাইছিলাম তখন না করল। অখন চাই না—আর ইসে ঘাড়ে চাপায়! এক্কেরে পাষাণ হৃদয়! খুনী ডাকাত গো সর্দার কি না!"

শালগ্রামের আত্মদান

রাজসাহী কলেজের দুইজন ছাত্র—প্রবোধ ভট্চায্ আর প্রভাস লাহিড়ী। পড়া শোনায় বেশ ছেলে এরা। আই, এ পড়ে। কিন্তু ১৯১৪ সালে সেকেণ্ডইয়ারে কোথায় আই, এ পরীক্ষার জন্যে হন্যে দিয়ে পড়বে—না দেখা গেল পড়শোনায় রীতিমত শিথিলতা সুরু করেছে। দিনরাত ফিসফাস্ গল্প করে। সন্ধ্যার পর পদ্মার ধারে আরও কয়েকটী ছেলের সাথে আড্ডা দেয়—এমন কি কলেজও কামাই করে মাঝে মাঝে। একদিন কেমিষ্ট্রী প্র্যাক্টিকাল ক্লাসে প্রফেসর অধিকারী রোল্কল্ কোরছেন। মাথা গুঁজে তিনি হেঁকে যাচ্ছেন টুয়েন্টি ফোর, টুয়েন্টি ফাইভ্ ইত্যাদি। ঠিক যখন থার্টি টু ডাক পড়েছে প্রবোধ উঠে জবাব দিল—"Yes Sir"—

প্রফেসর অধিকারী আবার হাঁকিলেন "থার্টি টু ?

প্রবোধ আবার জবাব দিল—"Yes Sir"

"Your name ?" হাঁকিলেন প্রোঃ অধিকারী।

"প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী—উত্তর দিল প্রবোধ।"

এইবার প্রফেসর অধিকারী হেসে উঠে বোললেন—I know Pravash more than you. He is my co-villager, almost next-door neighbour."

ক্লাস সমেত হাসির ধুম পড়ে গেল। বেকুব হয়ে প্রবোধ চন্দ্র সুট্ করে সরে পল ক্লাস থেকে।

সন্ধ্যার পর দুই বন্ধুতে দেখা হতেই প্রবোধ সবিস্তারে বর্ণনা কোরল ঘটনাটী। প্রভাস হাসতে হাসতে বলল, "আমি তো তোকে কেমিষ্ট্রী প্র্যাক্টীকালে প্রক্সি দিতে বলিনি।"

দুজনে একচোট হেসে নিল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রবোধ গম্ভীর হয়ে প্রভাসকে জানাল

"একাডেমী ইস্কুলেব একবেটা মাষ্টার ভয়ানক বেয়াদপী স্বরু করেছে। বেনামী চিঠি দিয়ে কয়েকবার শাসিয়েছিও। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! হতভাগা বদের হাঁড়ি, ছেলেদেব সর্বনাশ না কবে ছাড়বে না। একটু ধমকিয়ে দিতে হল দেখছি।"

জমকালো ধমকানোর ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যাব পব মাষ্টাব মশাই পদ্মাব ধার থেকে মেসে ফিবছেন। ঠিক সামনে থেকে কে যেন তাঁকে লক্ষ্য কবে বন্দুক ছুড়ল। লোক দেখা গেল না। শুধু শব্দ আর আগুনের ঝলক্ মাষ্টাব মশায়েব বোধগম্য হল। চীৎকাব করে দৌড়াতে দৌড়াতে মেসে ঢুকে তিনি নিজেব রুমে ধড়াস করে পড়ে গেলেন। ছাত্রেরা কি কি হ'ল 'স্যাব' কবে তাঁকে ঘিরে ধবল। তিনি শুধু কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"বন্দুক—খুন—জল!"

ছেলেবা হৈ হৈ করে এটা ওটা বলল। একটী ছেলে মাষ্টার মহাশয়েব টেবিল থেকে আবিষ্কাব করল একখানি কাগজ। তাতে লাল কালিতে লেখা আছে—"মাষ্টার। হুঁসিয়ার। ফের যদি ছেলেদেব সাথে মিশেছো—কি—গিয়েছো!"

এধারে উল্লাসিত চিত্তে প্রবোধ এসে বন্ধু প্রভাসকে জানাল—Operation successful!"

"খুন টুন হয়নি তো?"—প্রশ্ন কবল প্রভাস।

"আরে ছোঃ—"ঘৃণা ভরে জবাব দেয় প্রবোধ। "ছারপোকা মেরে হাত নষ্ট করব আমি? বলিস কি? একটা মাত্র ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ খরচ করেছি। তাতেই মাষ্টাব মশাই খাবি খাচ্ছেন।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে প্রবোধ এসে প্রভাসকে বললে—"এই তুই বই কিনেছিস্? দিতে পারিস কিছু? বাবা তো বেজায় চটিতং। ধুতি, জামা, বই কেনার জন্যে তিনি প্রায় আশী টাকা দিয়েছিলেন। আমি তো সবটাই জ্যোতিবাবুকে (শ্রীযোগেন্দ্র দাস ভট্টাচার্য্য) দিয়ে

দিয়েছি। এখন বাবা বলেন কোথায় তোর বই, কোথায় জামা, কোথায় ধুতি? দেখা বই;—ভ্যালা বিপদরে ভাই!"

প্রভাস জিজ্ঞাসা করল—"একেবারেই কিনিস্ নি? কিনে কি হবে? আর ক'দিন থাকব আমরা এ পৃথিবীতে? জানিস তো বিরজাবাবু (শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী—মহারাজ) বলে গেছেন চার পাঁচ মাসের মধ্যেই সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। এই বিপ্লবে বাঙ্গালীর করতে হবে সব চেয়ে বেশী ত্যাগ। বাংলাদেশে পলাশীর মাঠে ভারতে বিদেশীরাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহে সারা ভারতের মুক্তি-আহবে বাঙ্গালী যোগ দেয় নি। তাই বাঙ্গালীর রক্তে ধুয়ে নিতে হবে পলাশীর কলঙ্কের কালি,—সিপাহী বিদ্রোহে নিষ্ক্রিয়তার পাপ।" কিছুটা থেমে আবার হাসিমুখে বলল—'আরে—দুটী মাস পরে যে হবে বিপ্লবীবাহিনীর নায়ক,—সে কিনা আগে পিছে হেলে দুলে মাদুরে বসে মুখস্ত করেই চলবে—

টা ভ্যাম্ ভিস্, অসি ভ্যাম্ ভস্—অথবা—

No father—no mother did Lucy know—এটা নিতান্তই অসহ্য। তার জন্যে যথেষ্ট গো-বেচারী ভাল ছেলে আছে,—পাশে পাশে বিয়ের বাজারে যাদের দর বাড়ে,—সরকারী চাকরীর দিকে হা করে চাতকের মত যারা দিনরাত হাঁকছে—ফটিক জল—ফটিক জল।

দুই বন্ধু প্রাণ খুলে হেসে নিল। প্রভাস বলল—"সত্যিই ভাই! আমি তো একদম পড়তে পারিনে। ডিনামিকস্ খুলে যতই আওড়াই VT=UT+½+FT² ততই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রেস কোর্স আর পুলিশ স্কয়ার।" আবার হাসি।

এই ভাবেই দিন কাটছে তাদের। প্রায়ই আড্ডা বসে প্রভাসের ঘরে। সেখানেই মালদহের ফেরারী শ্রীহংসগোপাল আগরওয়ালা, মৈমনসিংহের ফেরারী যোগেন ভটচায ওরফে পণ্ডিত, ফেরারী দীনেশ

বিশ্বাস, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি এসে উপস্থিত হয়। মাঝে মাঝে দলের স্থানীয় নায়ক যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য ওরফে জ্যোতিবাবু, উত্তর বঙ্গের ইনচার্জ রাজেনবাবু (নলিনী ঘোষ), জঙ্গী বিভাগের নায়ক অমৃতলাল সরকার ওরফে পরেশ বাবু প্রভৃতিও এসে উপস্থিত হন। প্রভাসের ঘরে দুটো কৌটায় ভরা থাকে চিড়ে আর মুড়কি—নিদানের সম্বলরূপে। সারাদিন অনাহারের পর এই চিড়ে-মুড়কি চিবিয়ে কতদিন কত ফেরারী খিদের জ্বালা মিটিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে বলেছে—'আঃ—বাঁচা গেল।'

১৯১৪ সালের শেষ ভাগ। বিপ্লবীদের আসন্ন অভ্যুত্থানের জন্যে প্রচুর টাকা চাই। নাটোর মহকুমার ধরাইল গ্রামের জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছে। প্রবোধও জুটেছে সেখানে। সকলের মুখেই মুখোস। তাই নিজ নিজ ব্যাচের পাঁচ ছয় জন ছাড়া আর কে কে এই য়্যাকশানে অংশ গ্রহণ কোরেছে তা' জানার উপায় নাই। প্রভাস এই কাজে আছে প্রবোধ তা জানে না, প্রভাসও জানে না প্রবোধ আছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে। পূর্বনির্দিষ্ট আলাদা আলাদা পথে সকলে সরে পড়েছে। প্রবোধ যে ব্যাচে রয়েছে সেই ব্যাচটী এসে হাজির হয়েছে মাধনগর ষ্টেশনে।

ভোর হয়ে গ্যাছে। ডাউন প্যাসেঞ্জার আসতে দেরী নাই—ঘণ্টা হয়েছে। শেষরাতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে ধরাইল ডাকাতি সম্বন্ধে মেসেজ এসেছে। এই সময় প্রবোধদের ছয় জনকে দেখে ষ্টেশন মাষ্টারের মনে সন্দেহ হল। তিনি থানায় খবর পাঠালেন। গাড়ীও এল—পুলিশও এল। প্রবোধরা যেমনি গাড়ীতে উঠবে অমনি পুলিশদল তাদের গ্রেপ্তার করল। হৈ-চৈ হট্টগোলে একমাত্র পরেশবাবু পাশ কাটিয়ে ট্রেণে চাপলেন।

রাজসাহী শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সরকারী কর্মচারী শ্রীশবাবুর

ছেলে প্রবোধ ধরাইল ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছে। সঙ্গে আরও চারজন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রসিং, রাজসাহীর ললিত মৈত্র—আরও দু'জন। তাদের মধ্যে আছে রাজসাহী একাডেমীর ছাত্র—দেবেন।

ঘোড়া খুব ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যদি থেমে যায়, আরোহীর দেহের অধমাংশের গতিও সাথে সাথেই থামে। কিন্তু উত্তমাংশের গতি চলতেই থাকে পূর্ববৎ। তাই পাকা সওয়ার না হলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ঘোড়া থেকে। যারা প্রচণ্ড কর্মী তাদের যদি ছোঁ মেরে ধরে এনে আবদ্ধ করা যায় রুদ্ধ গৃহে,—মনের দিক দিয়ে অতিশয় সংযমী ও স্থিতধী না হলে অনেক সময় তারা তাল সামলাতে পারে না। মনের দিক দিয়ে কাঁচা কর্মীরা এরূপ ক্ষেত্রে হয় হতাশ,—নয় পাগল হয়ে যায়। আত্মহত্যাও আসে এই থেকে।

নিঃসঙ্গ কারাজীবন দেবেনের মাথা দিল বিগড়ে। সে আবোল তাবোল বকতে লাগল—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মানুষের সঙ্গ কামনা করতে লাগল। দুর্বলতার এই রন্ধ্রপথে সি, আই, ডিদের আনাগোনা সুরু হয়ে গেল। ব্যাপার বুঝে প্রবোধ আর তার সাথীরা প্রমাদ গণলো।

মাঝে মাঝে কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বিচারের জন্যে সকলকে একসাথে জেল থেকে কোর্টে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এরই মধ্যে প্রবোধ একদিন ফলাও করে দেবেনকে শুনিয়ে দিল আলীপুর জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার কাহিনী। আরও জানাল রুশ দেশের নিহিলিষ্ট আর ইতালীর কার্বোনারো দলের মত ভারতীয় বিপ্লবীদের রোষাগ্নি থেকে অব্যাহতি পাবার পথ জল, স্থল, অন্তরীক্ষে কোথাও নাই।

একদিন প্রবোধ এক সিপাহীর মারফত খবর পেল জেল গেটে একজন হোমরা চোমরা সি, আই, ডি অফিসার এসেছে—আর দেবেনকে তখনই

তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। স্নানাহারের জন্য সেলের কয়েদীদের সেলের সমুখের প্রাচীরঘেরা আঙ্গিনাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল সেই আঙ্গিনার প্রাচীরের উপরে প্রবোধের করাল মূর্তি। উস্কো খুস্কো চুল বাতাসে উড়ছে, রোষ-কষায়িত নয়নে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে; কণ্ঠে বজ্রের কড়্‌কড়ানির মত ধ্বনিত হল "দেবেন!" দেবেন সেই সংহার-মূর্তির দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউড়ে উঠে চোখ বুজল।

অবশ্য এই অপরাধের জন্য প্রবোধকে কয়েক রাত 'হাতকড়ি' সাজা দেওয়া হয়েছে।

প্রমাণ কিছুই না পেয়ে বিচারক আসামীদের বেকসুর খালাস দিলেন। কিন্তু পুলিশ তাতে হতাশ হল না। ফৌজদারী কার্যবিধি হাতড়ে তারা আবিষ্কার করল ১০৯ ধারা শুধু দাগী চোর বদমাইসদের ডাণ্ডা মারার জন্যই তৈরী হয়নি—এর দ্বারা রাজনৈতিক কর্মীদেরও ঠাণ্ডা করা যায়। মামলা চলল। জামীনে প্রবোধ বাহিরে এল। বলিষ্ঠ গঠন—রাজপুত্রের মত চেহারা, মাথার চুল ক্লিপ দিয়ে মোড়া। ফর্সা রং—টোকা দিলেই যেন রক্ত ঝরে পড়ে। শহরময় ঘুরে বেড়ায়—সি, আই, ডি, চরেরা পাছু প'ছু যায়। প্রবোধ মাঝে মাঝে হুকুম চালায়—এটা ওটা কিনে আনার জন্যে ওদের বাজারে পাঠায়। আদেশ অমান্য করলে থাপ্পড়, গাট্টা অথবা অন্তর্ধানের যে কোন একটিতে বিপন্ন হতে হবে বিবেচনায় আই, বি চরেরা আনত মস্তকে হুকুম পালন করে। এই অবসরে প্রবোধ দলের এর ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে।

প্রভাসের রিক্রুট বিমু মৈত্র (পরলোকগত) একদিন প্রবোধের সাথে দেখা করে বললে—ধীরেনদা (ঘটক) তো খুব পপুলার হয়ে পড়েছেন। রোগীর সেবা, শব-সৎকার, আগুন নেবানো আরও অনেক ভাল ভাল কাজ করছে তাঁর দল। ধীরেনদা বিউগল্ বাজালে শত শত ছেলে ছুটে আসে তাঁর সামনে।

প্রবোধ হেসে উত্তর দিল—আমরাও ওসব করি। কিন্তু ওটা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা জানি স্বাধীনতা সঞ্জীবনী সুধা—যা পেলে জাতির সব ব্যাধি সেরে যায় এক নিমিষেই—যার অভাবে জাতির সর্বদেহ ক্রমশঃ বিষিয়ে যায়। বিষের জ্বালায় জীবন যেখানে প্রতি মুহূর্তে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোন বিশেষ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে চক্‌চকে করবার চেষ্টার নাম 'পরাধীনের সমাজ সেবা'—মূঢ়তারই নামান্তর। এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, —কিন্তু এটা দেশ সেবা নয়—diversion.

বিমু জিজ্ঞেস করে, "কেন, রামকৃষ্ণ মিশন কি কোন কাজ করছে না ?" "কোরছে। কিন্তু সেটা সেবব্রতী রামকৃষ্ণ মিশনেরই কাজ—বিপ্লবী যুব-সমাজের কাজ নয়। আমরা জানি জাতির চরম কল্যাণ আসবে না ওতে। আজ দুচার জনের ব্যাধিতে—বিপদে, স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন মহামারীতে সেবার্থীদের হৃদয় কাঁদছে, কিন্তু স্বাধীনতা না পেলে দেশ জুড়ে কান্নার রোল উঠবে। কে কাকে দেখে। স্বাধীনতাই এর একমাত্র প্রতীকার"—বুঝিয়ে বলে প্রবোধ।

কিন্তু বেশী দিন সে এইভাবে থাকতে পেল না। তখন Defence of India Act জারী হয়েছে। সরকার বিপ্লবী সন্দেহে একে ওকে ধরছে আর অন্তরীণ করছে। প্রবোধকে প্রথমে রাজসাহী জিলায় তানোর থানায় অন্তরীণ করা হল। কিন্তু সেখানেও শহরের বিপ্লবীদের সাথে সংযোগের গন্ধ পেয়ে সরকার তাকে মালদহ জিলার এক থানায অন্তরীণ করল।

প্রভাস তখন দলের নির্দেশে কোলকাতার সিটি কলেজে পড়া সুরু করেছে। অখিল মিস্ত্রি লেনে একটি মেসে থাকে। একদিন সন্ধ্যার পর প্রভাস মেসে ফিরছে। গলির মুখে একটী লোককে দেখে সে চমকে উঠল। দেখতে মনে হয় যেন প্রবোধের

প্রেতাত্মা। রুক্ষ এলোমেলো পাগলের মত মাথার চুল, মলিন বস্ত্র, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে জামা নাই, ময়লা ছেঁড়া ধুতির আঁচল গায়ে দিয়ে—এবাড়ী সেবাড়ী চেয়ে চেয়ে দেখচে পাগলের মত।

প্রভাস আরো কাছে গেল এই বিকট মূর্তির। এইবারে পাগলটা ফিরে চাইল প্রভাসের দিকে,—তার মুখে আনন্দের হাসি ঝিলিক মেরে গেল। প্রভাসেব অবস্থাও বর্ণনাতীত। ইচ্ছা হয জড়িয়ে ধরে;—কিন্তু পথচারীর দল। কেউ যদি দেখে। এই বিবেচনা সংযত করল হৃদযাবেগ। আকস্মিক মিলনেব আনন্দপ্লাবনে নীরবেই ভেসে গেল দুইটি তরুণের প্রাণ।

প্রভাস যায় আগে আগে,—পিছে পিছে প্রবোধ। মেসে ঢুকেই হাত ধরে প্রবোধকে প্রভাস নিজের ঘবে নিযে গেল। তারপর আলো নিভিযে দুজন দুজনকে প্রাণভরে আলিঙ্গন কবল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র বিলম্বের অবসর নাই। মেসের অন্য কেউ দেখার আগেই প্রবোধকে রীতিমত ভদ্রলোক সাজাতে হবে। আলো জ্বেলে ক্ষিপ্রতাব সাথে চলল দাড়ি কামানো—তেল সাবানের সাহায্যে চেহাবাটি মোলায়েম কবা আর বেশ পবিবর্তন। আধ ঘণ্টাব মধ্যেই প্রবোধ রীতিমত ভদ্রলোক। মুড়ি আর দই খিদের জ্বালা কিছুটা মিটালো। এইবার প্রভাস জিজ্ঞাসা করলো—"এখন বল ব্যাপার কি?" প্রবোধ বললে—"ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ,—চলে এলাম।" "চলে যে এসেছিস তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেমন করে এলি? তোর জুতো জামা কোথায়? পাগল সেজেছিস্ কেন?"

বাধা দিযে প্রবোধ বললে—"আর বেশী জেরা করিস্নে। সব বলছি। আগে আর এক গ্যালাস জল দে। গলাটা মাঝে মাঝে শুকিয়ে কাঠ হযে যাচ্ছে। কয়েক দিন পর খাওয়া কিনা!"

এক নিঃশ্বাসে আর এক গ্লাস জল শেষ করে প্রবোধ সুরু করল কাহিনী।

ওরা ভেবেছিল অন্তরীণের আদেশ দিয়েই আমাকে দাবিয়ে রাখবে। অর্থাৎ এক টুকরো কাগজে "The Governor-General-in-Council is pleased to make the following orders" লিখে আমার বুকে সেঁটে দেবে আর তারই চাপে আমি দেবে যাব। কিন্তু গভর্ণর জেনারেলকে প্লীজ করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তাই একদা নিশীথ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। বৃষ্টি হচ্ছে। তারই মধ্যে হন্ হন্ করে হেঁটে হাজির হলেম মহানন্দার ধারে। ভাবলেম যদি একখানা নৌকো পাই তাতে চেপে 'অকূলে দেব তা ভাসায়ে,' কিন্তু সংসারের নিয়ম 'যাহা চাই তাহা পাইনে।' তাই জামা জুতো মহানন্দাকে উপহার দিয়ে জলে নামলেম। বেশী কষ্ট হলনারে প্রভাস! মাথার উপর টুপ্ টাপ্ থাকায় সাঁতারের ঝুপ্ ঝাপ্ ঢাকা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ মহানন্দে মহানন্দায় সাঁতার কেটে এক চরে এসে ঠেকলাম। হাঁটা সুরু করলেম। বোধ হয় প্রায় মাইল দেড়েক এসেছি। মাঝে মাঝে ঝাউয়ের জঙ্গলে পথ আটকায়। বড়ই কষ্ট হল এর ভিতর দিয়ে যেতে। এই দ্যাখ গা কত ছড়ে গেছে। ধুতি-খানাও মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেল। মনে হল শূয়োর শেয়াল আশ পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মাঝে মাঝেই চমকে উঠেছি। কিন্তু ওরাও বোধ হয় আমাকে ওদের চেয়ে বলশালী কোন জানোয়ার ভেবেছে। তাই ছুটে পালিয়েছে পাশ দিয়ে—আক্রমণ করেনি। সব চেয়ে বেশী ভয় কোরছিল সাপের। নদী-চরের ঝাউবনে কত সাপ থাকে জানিস্ তো। যাহোক চর পার হয়ে এলেম আর একটা নদীর তীরে। তার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনেই বুঝলেম ইনি আমাদের চিরপরিচিতা জননী পদ্মা।"

প্রভাস মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিল প্রবোধের কাহিনী। হঠাৎ সে প্রশ্ন কোরলে—"পদ্মাতেও ঝাঁপ দিলি নাকি?" 'হ্যাঁ, দিলাম'—জবাব দিল প্রবোধ।

তবে আত্মহত্যার জন্যে নয়—সাঁতরে পার হবার জন্যে। হলামও। কি জানিয়ে কে যেন আমার মনে যুগিয়েছে অদম্য প্রেরণা —দেহে দিয়েছে অসুরের শক্তি। আমি ভাবি আব অবাক্ হয়ে যাই। তখনকার প্রবোধ যে কত বড শক্তিশালী ভেবে ঠিক পাই না। তুই তো ফিলসফাব। বলতো—বলতো—এ কিসের প্রেরণা—কার শক্তি ?

"প্রেমেব"—

হা হা কবে বিকট হেসে উঠল প্রবোধ। হাসে আর বলে—"প্রেম ? প্রেম কিরে ? আমি প্রেমিক ? বিল্বমঙ্গল নাতো ?" বাধা দিয়ে প্রভাস বলে, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুই প্রেমিক। তবে দেশপ্রেমিক। দেশ-প্রেমই তোকে প্রেরণা যুগিযেছে।"

"যাক্—খুব বাঁচিয়েছিস্ যা হোক। শেষে যে "কই সই। কোথা চিন্তামণি"—বলে পথে পথে বেডাতে হয়নি এই ঢের। তারপর শোন্। পদ্মাতো পার হলেম। কিন্তু পাডের ওপর উঠতে পারিনে। হাত পা একদম অসাড। কিছুটা শুয়ে থাকলেম। এ দিকে ভোর হয়ে আসছে। আর বেশী দেবী করা যায় না। হয়তো ধরা পডে যাব। তাই হামাগুডি দিয়ে কোন প্রকারে উপরে উঠলেম। আঁধারটা তখন ফিকে হয়ে এসেছে। একটা পথের দাগ ধরে চলতে লাগলেম। কিছুদূর যেযে একটা জঙ্গল পেয়ে তাতে ঢুকলাম। আশ্‌শ্যাওড়ার ফল আর করঞ্চা যে এত মিষ্টি লাগে—তা তো আগে জানতেম না। এর পর থেকে দিনের বেলা জঙ্গলে লুকিযে থাকি আর রাতে পথ চলি। বিপদ হল এই চেহারা নিয়ে। তোরা হামেশাই বোলেছিস্—প্রবোধ চেহারায় রাজপুত্তুর। কিন্তু এই রাজপুত্তুরই শোত্তুর হয়েছে আমার। কালো কদাকার হলে মিশে পডতাম চাষী-মুজুরের দলে। এত কষ্ট পেতে হত না—বেশ আসা যেত।"

পরদিন প্রত্যুষে প্রভাস প্রবোধকে দলের নেতা রাজেন বাবুর বাসায় নিয়ে গেল। রাজেন বাবু জিজ্ঞেস কোরলেন "দলের নির্দেশ না লইয়া চইল্যা আইলেন যে?"

গম্ভীর হযে প্রবোধ জবাব দিল—"অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হযেছে। তা হয়েছে। কিন্তু শৃঙ্খলের শব্দটা কাণে বড্ড বাজছিল। তাই রেগে-মেগে ভাঙ্গতে গিযে শৃঙ্খল,—ভেঙ্গে ফেলেছি শৃঙ্খলা।

রাজেন বাবু, জ্যোতি বাবু, প্রভাস সব একসাথে হেসে উঠলেন। রাজেন বাবু বললেন—"Good! অখন আপনারে কি কাজে লাগাই—কয়েন তো! একটা জিলার অর্গানিজেশনের ভার লইযা যান্ গিযা"

—"অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে শাস্তি দিতে চান। ভার দিলে মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু আমার যে একটা মস্ত দোষ আছে। কেউ যদি একবার কথা না শোনে দ্বিতীযবার বলার আগেই আমার হাত চলে যায।"

রাজেন বাবু জবাব দিলেন—"যে ভার দিত্যাছি, এইবার দেখুম হাত চলে—না মুখ চলে।"

ত্রিপুরা জেলার ভার নিয়ে প্রবোধ চলে গেল কুমিল্লায। সেখানে সকলে তাকে রঞ্জনদা নামে ডাকে। ছেলে মহলে রঞ্জনদা ভারী প্রিয়। বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী অতীন রায়, যোগেশ চ্যাটার্জি, ভটচায ভ্রাতৃদ্বয, অমূল্য মুখার্জি, সুরেন রায, মনীন্দ্র চক্রবর্তী সুযোগ পেলেই তাঁর চার পাশে ভিড় করে আসে। ছেলেরা বলে—"রঞ্জনদা! আপনাগো হ্যাশের কথা খুব খারাপ। একবার কয়েন তো শুনি 'খাল্যাম—যাল্যাম—এঠি—ওঠি' —সব একসাথে হেসে উঠে।

রঞ্জনদা বলেন—"আমার কথা তো খারাপই লাগবে। আমি যে বলতে পারিনে—মাছের জুল—কোরতাম পারতাম না—খাইতাম না ক্যারে—

ছেলেরা জোর করে রঞ্জনদার মুখ চেপে ধরে।

* * * *

কেন্দ্র থেকে খবর এসেছে—টাকা চাই, বিশেষ প্রয়োজন। Violence Department এর অন্যতম অধিনায়ক জামাইবাবু তখন কুমিল্লায়। তিনি একটা Swift action এর ব্যবস্থা করলেন।

ত্রিপুরা জিলার ললিতাসর গ্রামে একবার মহাজন গৃহে ছয়জন সাথী সহ তিনি হানা দিলেন। রঞ্জনদা'ও ছিল এই দলে! দুটী মশার পিস্তল, দুটী রিভলভার, ছেনি, হাতুড়ী মাত্র সম্বল নিয়ে তাঁরা হাজার দশেক টাকা লুটে নিলেন। কিন্তু বাড়ীর বাহিরে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। দলে দলে গ্রামবাসী হৈ হৈ করে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। রঞ্জনদা'রা মাঠ ভেঙ্গে দৌড় দিলেন। কিন্তু কাঁচা টাকার থলে ঘাড়ে করে দৌড়ানো এক হাঙ্গামার ব্যাপার। ওধারে লাঠি, সোটা, বর্শা—যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই গ্রামবাসীরা ছুটে আসছে তাড়া করে। মাঠ পেরিয়ে গ্রামান্তরে ঢুকতেই সেখানকার লোকরাও 'ডাকাত' 'ডাকাত' হৈ হল্লা শুনে পথরোধ করে দাঁড়ায়। অনুসরণকারী জনতা যেই কাছাকাছি আসে অমনিই রঞ্জনদারা ফেলে দেন এক থলে টাকা। জনতা থমকে দাঁড়ায়—এই অবসরে রঞ্জনদারা এগিয়ে যান। এই প্রকারে প্রায় মাইল তিনেক এসেছেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে পাঁচ সাত গ্রামের জনতা পথে বেরিয়েছে। গত্যন্তর না দেখে স্বদেশী ডাকাতরা একটী জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। অনুসরণকারী জনতা জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হতেই জামাইবাবু চীৎকার করে বললেন—"ভাই সব ফিইরা যাও। আমাগো সোনার দ্যাশ যারা লুট্ট্যা খায় তাগো তাড়ামু আমরা দ্যাশ হইতে। হের লাইগা টাকা চাই। তাই লুটছি মহাজনরে। হের লাইগা তোমরা জান দিবা? আমাগো হাতে পিস্তল আছে—বন্দুক আছে। তোমরা আর আগাইলে গুলী করুম। ক্যান্ মিছামিছি জান দিবা—কওতো? তাই আবার

কই—ফিইরা যাও—ভাই সব ! ফিইরা যাও।”

সঙ্গে সঙ্গেই বিভলভাব ও পিস্তল গর্জে উঠল। জনতা থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কে একজন চীৎকাব কবে বলল “পট্‌কা বে—পট্‌কা।” আবাব বিবাট কোলাহল সুরু হল,—জনতা মাব মাব শব্দে এগিয়ে আসতে লাগল। এবাবে বঞ্জনদাবা সত্যই গুলী চালালেন। কিন্তু মশার পিস্তলের ছোট্ট শব্দ। ফলে গুলী খেয়ে লোকও পড়েছে—ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে জনতাও এগিয়ে চলেছে। স্বদেশী দল গুলী চালায আব জঙ্গলের ভিতরে ধীবে ধীবে পিছু হটে। এইভাবে কিছুটা এসেই রঞ্জনদা বললেন, “একি ? আমি যে আর দাঁড়াতে পাবিনে। আমাব সাবা শরীর ঝিম্ ঝিম কবছে। পায়ে কিসে যেন কামড়েছে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।”

সর্দার (শ্রীহট্টের প্রফুল্ল বায়) আব ষ্টাব এসে বঞ্জনদাকে বয়ে নিয়ে চলল। এধাবে অপর চাব জন সমানেই চালাচ্ছে গুলী। ক্রমে রঞ্জনদার কথা জড়িয়ে এল। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন—“ভোজালী দিয়ে আমার মাথাটা কেটে নিযে আপনারা সবে পড়ুন। সর্পাঘাত—সর্পাঘাত। আমি বাঁচব না—আপনারা বাঁচুন—

সর্দার বলে উঠলেন—“আমাগো প্রাণ বইতে ছাড়ুম না আপনাবে”।

বযেই নিয়ে চললেন তাঁবা।

কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। নিয়তির আঘাত রোধ করা গেল না। রঞ্জনদার দেহ এলিয়ে পল,—মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। ষ্টার আব সর্দাব তাঁকে শুইয়ে দিলেন জঙ্গলের মধ্যে। নাকের কাছে হাত ধরে বুঝলেন নিঃশ্বাস চলছে না। আর কোন আশা নাই দেখে উভয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নীরবেই বিদায় নিলেন মহানিদ্রিত বন্ধুর কাছে।

পবদিন বৈকালে দশটী লাস এসে পৌছিয়েছে কুমিল্লার মোর্গে।

শহরময় গুজব রটেছে—ডাকাত মরেছে—তার লাস এসেছে।

অমূল্য, মনীন্দ্র আরও কয়েকটী ছেলে মোর্গে ডাকাতের লাস দেখতে গেছে!—দশটী লাস পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটীকে দেখেই তারা চমকে উঠলো। সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, বিবর্ণ—কালো—চেনাই যায় না পড়ে আছেন রঞ্জনদা।

* * * *

১৯২২ সাল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ছোট ফিলসফার পার্টির সংগঠনে গিয়েছেন বগুড়ায়। তার পিছু পিছু স্পাই ঘুরছে। কোন মতে তাদের এড়িয়ে সে গেল কংগ্রেস নেতা শ্রীসুরেশ দাশগুপ্তের গৃহে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো—"সুরেশদা! যতীনদা কোথায়?"

সুরেশবাবু বিস্মিত হলেন তাকে দেখে। বললেন, "ইঃ—তোমার সারা শরীর যে ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। আচ্ছা—বোলতে পার তোমাদের এই গোপন তপস্যার ফল কি? এতে লাভ?"

—"লাভ স্বাধীনতা"—হেসে উত্তর দিল ছোট ফিলসফার। "আগে স্বাধীনতা লাভ হোক—তখন আমাদের তপস্যার ফল জনতার প্রতিনিধিদের হাতে সঁপে দিয়ে বিদায় নেব আমরা!—যাকগে—যতীনদার বাসাতেই যাই।"

যতীনদা বৈঠকখানায় একাই ব'সে ছিলেন। ছোট ফিলোকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। একটী কথাও বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রইল ছোট ফিলসফার। তারপর আহত স্বরে বলল— "আমাকে কি ফিরেই যেতে হবে? সারাদিন খাওয়া হয়নি। তখন সন্ধ্যা ছয়টা। এখানেও কি দুমুঠো ভাত জুটবে না?—যাক্—

'ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না"—

ছোট ফিলে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ যতীনদা রাগে ফেটে

পলেন। চীৎকার করে বললেন—"বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—আমার সুমুখ থেকে। খুনী ডাকাতের দল—তোরা শুধু খুন করতেই জানিস্—ডাকাতি করতেই জানিস! তোরা কি করে জানবি দেবতার মর্যাদা? তোরা প্রবোধকে ডাকাতিতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিস্,—তোরা শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাঁটনা বেটেছিস্!"

তারপর কিছুটা থেমে আবার বললেন—

'ওরে—ওরে। আমি যে কল্পনাও করতে পারিনে প্রবোধ ডাকাতিতে গিয়ে মারা গিয়েছে। যদিও সে ভিন্ন দলের কিন্তু সে যে সর্বদাই আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে বিপ্লবী জনতার নায়করূপে—বিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি-মূর্তিতে! ওরে। আমি যে ভাবতেই পারিনে প্রবোধ ডাকাত! তোরা বর্বর—তোরা দস্যু! তোরা দেবতাকে ডাকাত বানিয়েছিস্—তোরা দেবতার অমর্যাদা করেছিস্—তোরা করেছিস্—শালগ্রামের অপমান।"

জল ঝরতে লাগল যতীন দা'র চোখে। এই উচ্ছ্বাসের মুখে ছোট-ফিলো খেই হারিয়ে ফেলেছিল। যতীনদার চোখের জলে তার অন্তরও ছলছলিয়ে উঠেছিল। কোনরূপে আত্মসম্বরণ করে সে যতীনদার পদধূলি নিয়ে ধীরে ধীরে বলল—"যতীনদা! এতো শালগ্রামের অপমান নয়,—এযে শালগ্রামের আত্মদান।"

———

মাসীমা

বীরভূম জিলার নলহাটী থানার ঝাউপাড়া গ্রামে মাইনিং ক্লাশের ছাত্র শ্রীনিবারণ ঘটকের মাসীমা তুকড়িবালা দেবীর বাড়ী। মাসীমা বড়ই ভালবাসেন নিবারণকে,—নিবারণও তাঁকে মায়ের মতই দেখে। অবসর পেলেই নিবারণ মাসীমার বাড়ী যায়—কখন কখনও পাঁচ সাতদিন থাকেও সেখানে। ইদানীং তার যাতায়াত বড়ই ঘন ঘন হয়েছে। মাঝে মাঝে তু'একজন বন্ধুও যায় তার সাথে। মাসীমা তাতে খুশীই হন। কেউ কেউ মাসীমাকে "মাসীমা" বলে ডেকে ডেকে নিবারণের মতই নিকটে গেছে তাঁর—বড় সুবোধ ছেলে এরা। কোন দেমাক নেই, হৈ হল্লা নেই, —শাকচচ্চড়ি যা' পায় তাই খায়। কিছুদিন এইভাবে আনাগোনার পর নিবারণের আচরণ ক্রমেই যেন মাসীমার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকতে লাগল। নিবারণ ব্যাপারের মধ্যে বই লুকিয়ে আনে—জিজ্ঞেস করলে বলে—"ও একখানা মাইনিং বই মাসীমা!" কিন্তু একদিন তো তিনি দেখেই ফেলেছেন বইখানার নাম "দেশের কথা"—প্রণেতা সখরাম-গণেশ দেউস্কর। তার পর লুকিয়ে চুরিয়ে আরো আসে বই। মাসীমার দৃষ্টি এড়ায় না। চুপি চুপি আনা বই চুপি চুপিই তিনি দেখেন। অবশেষে একদিন একখানি বইয়ের ভাঁজে "যুগান্তর" শীর্ষক ইস্তাহার দেখে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হলেন। নিবারণকে ডেকে বল্লেন—"নিবারণ! এসব তোমার হচ্ছে কি? তুমি স্বদেশীদলে ঢুকেছ। জান এতে তোমার সমূহ বিপদ?"

নিবারণ একগাল হেসে জবাব দিল—"তোমার যেমন বুদ্ধি মাসীমা! আমি যোগ দেব স্বদেশীদলে! আমি জানি ওরা খুন করে—ডাকাতি করে—সরকারের বিরুদ্ধে তলে তলে ষড়যন্ত্র করে। আমি মাইনিং-এর ছাত্র। কালে হব কয়লাখনির ম্যানেজার। আমি ঐ ডাকাত দলে

যোগ দিয়ে নিজের ভবিষ্যত খোয়াব। কি যে বল!"

তবু মাসীমার মন থেকে সন্দেহ যায় না। নিবারণের সাথে আরো অনেকে আসে তাঁর বাড়ীতে। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে—"এঁকে চেন না মাসীমা? বা—রে! বেশ মজাতো! এ যে আমাদের সুধাদির দেওর,—সেই যে দেখা হয়েছিল বোলপুরে!" এমনি কত কি বলে সে অর্থাৎ জোর করেই চেনাতে চায়। মাসীমা হাসেন আর বলেন—"থাক্ থাক্—ঢের হযেছে। আর পরিচয়ে দরকার নেই;—দযা করে এইবার বল খাওয়া হয়েছে তো?"

একদিন এক বয়স্ক লোক এসে হাজির হলেন নিবারণের সাথে। সদাপ্রসন্ন—সাদাসিদে অথচ গম্ভীর। মাসীমা জিজ্ঞেস করার আগেই নিবারণ পরিচয দিল—"ইনি আমাদের মাষ্টারমশাই। খুব ভালো লোক—আর খুব ভালবাসেন আমাকে। তোমাকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি!"

সহসা মাসীমা চটে গেলেন। রাগত স্বরে বললেন—"সব তাতেই তোমাদের ছেলেমানুষি! মাষ্টার মশাযকে আনছো,—আগে কেন জানাওনি আমাকে? পাড়াগাঁ, এখন কি করি আমি।"

"কিচ্ছু করতে হবে না মাসীমা! স্রেফ ডাল আর ভাত—" নিবারণ হাসিমুখে জবাব দেয়।

খাবার সময় নিবারণ সবিস্ময়ে দেখল মাসীমা বিরাট আযোজন ক'রে ফেলেছেন। মাষ্টার মশাই তা' দেখে বল্লেন—"একি নিবারণ! এ যে রাজভোগ। অভাগার পেটে সইলে হয।" তারপর মাসীমাকে ডেকে সস্নেহে বললেন—"শোন মা! বৃটিশ ভারতের বাইশকোটি লোকের মধ্যে প্রায সাড়ে দশকোটি অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কুকুর বিড়ালের মত জীবন যাপন করছে তারা। অশন বসনের বিলাস তো আমাদের শোভা পায না মা! আজ আমার জন্য যে আযোজন করেছ তুমি তাতে অন্ততঃ চারজন ভারতবাসীকে অনাহারে থাকতে হবে। তাই আমি যদি

সব না খাই তুমি দুঃখ করো না। মনে কোরো তোমার ক্ষ্যাপা ছেলের এ একটা ক্ষ্যাপামি।"

কথাগুলি এত মিষ্টি লাগল মাসীমার যে তিনি কোন প্রতিবাদের কথাও খুঁজে পেলেন না। মনে হল যেন কোন ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তেই দিয়ে গেলেন দিব্যদৃষ্টি ;—তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ভারতের রূপ! কোটি কোটি কঙ্কালসার নরনারী নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে দলে দলে। মুখে হাসি নাই, ভাষা নাই, নয়নে নাই দীপ্তি, বুকে নাই আশা। —কে যেন কেড়ে নিয়েছে সব। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু সম্বল ক'রে এই জীবন্মৃতের দল ধুঁকে ধুঁকে অতিক্রম করেছে জীবনের পথ। জল এলো মাসীমার চোখে।

বিদায়ের সময়—"বাবা! আবার আসবেন"—বলেই যেমন তিনি মাষ্টার মশাইকে প্রণাম করতে গিয়েছেন অমনিই কিছুটা পিছিয়ে মাষ্টার মশাই বলে উঠলেন—"কর কি—কর কি আমি শুদ্দুর—কায়েত—আর তোমরা যে বামুন! তারপর আমি যে তোমার ছেলে—বুড়ো ছেলে—ছেলেকে কি প্রণাম করতে হয়?" মাষ্টার মশাই ক্ষিপ্রতার সাথে মাসীমাকে প্রণাম করলেন।

মাসীমার মনে হ'ল কোন এক দেবতার স্নেহস্পর্শ সর্বদেহে এনেছে রোমাঞ্চ—আশীষের পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে তাঁর শিরে,—অন্তর গেয়েছে ভ'রে।

এরই কয়েক দিন পরে। কোনক্রমে বাইরের ঘরের দোর খুলে গভীর রাতে নিবারণ ছয় সাতটী বন্ধু সহ ঢুকেছে ঘরে। মাসীমা যেন না জানেন। ভোরের আগেই সরে পড়বে সকলে—থাকবে একা নিবারণ। ফিস্‌ফিস্ করে কথা চলেছে তাদের। হঠাৎ মাসীমার শব্দ পেয়ে ফিস্‌ফাস্ গেল থেমে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যেন আর চলে না। তবু তারা রক্ষে পেল না। মাসীমা দোরের কাছে এসে অনুচ্চস্বরে বললেন—"দোর খোল।" উপায় নাই—খুলতেই হ'ল দ্বার। আলো নিয়ে ঘরে ঢুকেই

মাসীমা অবাক্ হ'য়ে গেলেন। একটী ছেলের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ছেলেটীর শরীরে দুই তিন স্থানে গভীর ক্ষত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে—কাপড় চোপড় ভিজে লাল হয়ে গেছে—অথচ মুখে একটি কাতর শব্দ নাই—দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রয়েছে সে। "আমার মরণ হয় না।" বলেই মাসীমা চোখে আঁচল দিলেন। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ফিরে এলেন আইডিনের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে। ক্ষতস্থানগুলিতে আইডিন ছুঁইয়ে তার উপর দিলেন গাঁদার পাতা থেঁতো করে। তার উপর তুলো চেপে নিপুণহাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। বাঁধা শেষ হলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আলো নিয়ে। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে আবার ফিরে এলেন তিনি নিবারণকে সম্বোধন করে বললেন—"পিণ্ডি গিলবে এসো।" আদেশের স্বরে বললেন—"নিয়ে এসো ওদের।" বিনা বাক্যব্যয়ে সকলেই চলল মাসীমার পিছে পিছে। খেতে বসিয়ে দিয়ে ধমকিয়ে বল্লেন—"খাওয়া হয়নি বলতে পার না তুমি? এতগুলি ছেলে অনাহারে থাকবে, খেয়াল নাই তোমার? বেশ বাহাদুরীর কাজ করে এসেছ—নচ্ছার কোথাকার!"

ভোরের আগেই সকলে সরে পড়েছে—মায় ঐ আহত ছেলেটী পর্যন্ত। দু'একদিনের মধ্যেই মাসীমা শুনতে পেলেন সিয়ারসোল খনির কাছে এক পল্লীকুটীরে বিস্ফোরণ উপলক্ষ ক'রে পুলিশ আবিষ্কার করেছে এক বোমার কারখানা। কেউ ধরা পড়েনি। তবে প্রচুর বোমার খোল ও মাল মশলা পুলিশের হস্তগত হয়েছে। জোর চলেছে অনুসন্ধান। অঞ্চলটা ছেয়ে ফেলেছে সি, আই, ডি। মাসীমা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। পাছে যদি ধরা পড়ে ওরা। বারবার ঐ আহত ছেলেটীর মুখখানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে—মনে হয় কি কঠিন প্রাণ এদের। মরণের মুখেও যন্ত্রণা প্রকাশ নাই।

এই সহানুভূতি, এই করুণা ক্রমে ক্রমে আগুন জ্বালল মাসীমার মনে।

নিবারণ, মাষ্টার মশাই. নিবারণের সঙ্গীরা, দেশের কথা, যুগান্তর সবটায় মিলে তাঁর অন্তরে এক দুর্বোধ্য জ্বালার দাবানল সৃষ্টি করল। কিছুই ভাল লাগে না মাসীমার। পিতা, পতি, পুত্র, ঘর, সংসার—সবই অসার বোধ হতে লাগল। দেহ, মন ক্রমেই রুক্ষ হতে লাগল—সংসারের ভাল কথাটাও যেন আর তাঁর গায়ে সয় না। এই জ্বালার একমাত্র শান্তি-প্রলেপ ছিল নিবারণ। নিবারণ এলে মাসীমা শান্ত হন,--মাসী-বোনপোতে মিলে দেশের কথা আলোচনা করেন।

সেই সময় সিয়ারসোল রাজবাড়ীতে একজন নূতন কর্মচারী এসে জুটেছেন। নাম তাঁর রণেন বাবু। রণেন বাবু লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরাখেলায় ভারী ওস্তাদ। তরুণ মহলে তাঁর অসীম প্রতাপ—তিনি সকলকে লাঠি খেলা শেখান। নিবারণ ভারি প্রিয় তাঁর। নিবারণ মাঝে মাঝে মাসীমাকে সিয়ারসোল নিয়ে যেত—লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, অসিখেলা দেখতে। ক্রমে মাসীমার সাথে রণেন বাবুর পরিচয় হল। তাঁর শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয় দেখে মাসীমা মুগ্ধ হলেন।

কিন্তু বেশী দিন গেল না। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারকারী নন্দলাল ব্যানার্জি কোলকাতায় নিহত হলেন। সেই সম্পর্কে সি, আই, ডিরা ছুটে এল সিয়ারসোলে রণেন গাঙ্গুলীর সন্ধানে। সিয়ারসোল আর পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসীরা শুনে স্তম্ভিত হল রণেন গাঙ্গুলী রাজষ্টেটের নিরীহ কর্মচারী নয়—সে হচ্ছে মুরারীপুকুর বোমা মামলার ফেরারী আসামী প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী।

এরপর এক সমস্যা দেখা দিল। নিবারণের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হবার মধ্যে। নিবারণ ঘোরতর আপত্তি তুললে। কিছুতেই রাজী হয় না বিয়ে কোরতে। তাকে রাজী করানোর ভার সকলে মিলে দিল মাসীমাকে। মাসীমা বোনপোতে প্রবল তর্ক সুরু হল। সর্ত রইল, যে হারবে তাকে অপরের অনুসৃত পথ ও মত বরণ করতে হবে। মাসীমা বোঝান গার্হস্থ্য

ধর্ম,—বোঝান সতীকে পতির অনুগামিনী করে নেবার শিক্ষাদানের কথা,—নিবারণ বলে দেশসেবার কথা,—বিবাহে সে পথে সম্ভাব্য বাধা বিপত্তির কথা। অবশেষে তর্কযুদ্ধে মাসীমা হেরে গেলেন। কিন্তু এই পরাজয়ে তাঁর মনে এল না কোন গ্লানি,—এল অপার আনন্দ। মনে হল পরাজয় দিয়েছে তাঁর ঈপ্সিতের সন্ধান, বহু দিনের কামনার পথে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। এই পরাজয়ই যেন তিনি কামনা করেছিলেন মনের কোণে সংগোপনে।

মাসীমা বল্লেন—নিবারণ! এইবার দলে ভর্তি করে নাও। নিবারণ চিন্তিত হল। সন্দেহের সুরে বলল—"এ পথ অত্যন্ত ভীষণ,—পদে পদে বিপদ। গেরস্ত ঘরের বৌ,—ছেলেপুলের মা,—তুমি কি পারবে এ পথে চলতে? বড় বড় বীরপুরুষেরা হিম সিম খেয়ে যায়। নাই বা এলে!"

সহসা মাসীমার অন্তরের জ্বালা ফুটে বেরুল চোখে মুখে। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আত্মস্তবিতায় অন্ধ হয়েছ তোমরা। জনা, বিহুলা, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই,—এ দেশের মেয়ে নয়? মনে রেখ তুমি যদি জীবন দিতে পার দেশের জন্যে, তোমার মাও পাবে। সিংহের জননী সিংহিনীই হয়।" মাসীমা বিপ্লবদলের সভ্যা হলেন।

মাসীমার মনে অমিত তেজ। অভূতপূর্ব সাড়া তাঁর অন্তরকে চঞ্চল করে তুলেছে। দলের সব কাজেই তাঁর উৎসাহের অন্ত নাই। মাতা ও সন্তান সহকর্মী। দুজনের মনেই আনন্দ আর ধরে না।

একদিন নিবারণ একটী বাক্স এনে মাসীমাকে দিয়ে বলল—"খুব সাবধানে রেখ, মাসীমা। ধরা পলে একদম কালাপানি।"

বাক্সের ভিতর ছিল সাতটী মশার পিস্তল। রডা কোম্পানীর খোয়া যাওয়া মাল। মাসীমা নেড়ে চেড়ে দেখলেন। গুলীভরা, বের করা, সেফ্‌টী, রেঞ্জ- সব শিখে নিলেন নিবারণের কাছে। বেশ যত্নে জিনিষ-গুলো রাখলেন তিনি।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাস। মাসীমা ঘুম থেকে উঠে পাকঘরে যেতেই দেখতে পেলেন প্রাচীরের উপর দুই তিনটী পুলিশের সেপাই। খিড়কীর দোর জানালা খুলেই তিনি বুঝলেন সমস্ত বাড়ীখানি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর সমস্ত অন্তর আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু এই আর্তস্বরের মাঝে নিজের চিন্তা কিছুই ছিল না। নিবারণ, বিপ্লবদল ও জিনিষগুলি—এই তিনটীই তাঁর হাহাকার জুড়ে রয়েছে।

অনেক তল্লাসীর পর পুলিশদল বের করল মশার পিস্তলের বাক্সটী। সি, আই, ডি অফিসর সুবোধ চক্রবর্তী মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—চাবি কোথায়?

জানি না—উত্তর দিলেন মাসীমা।

তালা ভেঙ্গে বাক্স খোলা হল। সাত সাতটী মশার পিস্তল দেখেই পুলিশ দল আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। সুবোধ বাবু মাসীমাকে প্রশ্ন করলেন—কোথায় পেলেন এই বাক্স?

মাসীমা ততক্ষণে কতব্য স্থির করে ফেলেছেন। নিবারণকে বাঁচাতেই হবে। সে তাঁর বোনপো বলে নয়। যে কটী মুষ্টিমেয় ছেলে নিজের সুখ, সমৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ পায়ে দলে স্বেচ্ছায় তেত্রিশ কোটি মানবের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে—নিবারণ তাদেরই একজন। নিবারণের এই বিরাট রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল মাসীমার দৃষ্টিতে। মাসীমাকে নীরব দেখে পুনরায় প্রশ্ন হল- কোথায় পেলেন এসব?

"বলব না"—উত্তর দিলেন মাসীমা।

"সত্যি বলুন। নিবারণ দিয়েছে? সব খুলে বলুন, কিচ্ছু হবে না আপনার। নৈলে জেল হবে।"

"নিবারণ এর কিছু জানে না—এর বেশী কিছু বলব না"—শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন মাসীমা।

ভীতি-প্রদর্শন, প্রলোভন, মিষ্টকথা কোনটাতেই কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে পুলিশদল মাসীমাকে গ্রেপ্তার করল। কোলে তাঁর শিশু সন্তান। আর সব ছেলেরা ও আত্মীয়স্বজন কাঁদতে লাগল। পুলিশের কর্তা বললেন "কোলের ছেলেটীকে আপনি সাথে নিতে পারেন।"

নিছক মনের জোরেই অশ্রুরোধ করে মাসীমা বল্লেন—"না—না—ও যাবে না আমার সাথে। আমি একাই যাব—একাই যাব।" তারপর শিশুটীকে একটু আদর করলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বল্লেন—"আমার ছেলেদের দেখো তোমরা। ওরা যখন মা মা বলে কাঁদবে—তোমরা বুঝিয়ে বোলো—'তোদের মাকে বৃটিশ সরকার ধরে নিয়ে গেছে জেলে'।"

তারপর পুলিশ-পরিবৃতা মাসীমা, বাংলার নিভৃত পল্লীর বধূ দুকড়িবালা অগ্রসর হলেন সিউড়ির পথে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের কালে তিনি যখন দেখতে পেলেন নিবারণও রেহাই পায়নি—সেও ঐ একই মামলার আসামী,—তখন আর তিনি অশ্রুরোধ করতে পারেননি। এতো করেও বাঁচানো গেল না নিবারণকে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাসীমা আর বোনপো। মৃদুস্বরে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন-"নিবারণ। মাষ্টার মশাই ঠিক আছে তো?"

ঈষৎ হেসে নিবারণ উত্তর দিল—"তিনি আগেই গেছেন।"

"এবার বলবে তিনি কে?"

নিবারণ কিছুটা নীরব থেকে পরে চাপা গলায় উত্তর দিল—"অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ।"

বিচারে নিবারণের পাঁচ বছর ও মাসীমার তিন বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হ'ল। হাসিমুখে দুইজনই ১৯১৭ সালের জেলের ভীষণতা বরণ করে নিল। দুইজনেই বদলী হল প্রেসিডেন্সি জেলে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের এই প্রথম নারী সৈনিক সে কালের কারাগারের দুর্বিষহ

পবিবেশের ভেতর থেকে পিতার কাছে প্রথম পত্র লিখলেন—"আমি বেশ আছি। কিছুই ভেব না আমার জন্যে। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবে। বাচ্চাদেব ভুলিযে বেখ। তারা মা মা করে কাঁদলে আমি এখানেই চঞ্চল হ'যে উঠব। প্রণাম নিবো।—

ইতি সেবিকা

দুকড়িবালা।"

— — —

বন্ধু

গৌহাটীর ফ্যান্সিবাজাব মহল্লাব একখানি ছোট্ট টীনের ঘব—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই বাসায কযেকটি তরুণ যুবক আনাগোনা করে—বেশীব ভাগ সন্ধ্যার পরেই। দিনের বেলায বাহিরের বারান্দায় দু'এক-খানা ধুতি-শাড়ী রোদে শুকাতে দেখা যায, কোনদিন বা একটি ছেলেকে ইংরাজী পাঠ মুখস্থ কবতেও শুনা যাব। এব বাড়া মানুষের সাড়া বড একটা পাওযা যায না। বাতে কিন্তু অন্য প্রকাব,—অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে -মানুষের আনাগোনা ও সংযত কণ্ঠের কথাবার্তায় চঞ্চল হযে ওঠে বাসাখানি। বাসাব স্থাযী বাসিন্দা তিনজন,—কেউ কাউকে চেনে না—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককেই পরমাত্মীয় জ্ঞান কবে। মৈমনসিংহেব মণী রায দলের আদেশে ফেবারী হযে জুটেছে এখানে, অপর বন্ধুরা জানে তাকে রণেশ বলে। আর একজন উত্তরবঙ্গের লোক—তার পরিচয নৃপেন নামে। তৃতীয ব্যক্তি একটু বেশী বয়সের—এই পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। তিনি সমিতির প্রাদেশিক পরিচালক—ডাকে সকলে কর্তা বলে।

কর্তা একদিন বিকেলে রণেশকে ডেকে বল্লেন—"আজ সন্ধ্যায় আপ ট্রেনে তিনজন লোক আসার কথা আছে। তাদের একজনের বাঁ হাতে হলদে মলাটের একখানা বই—ডানহাতে একটি পেয়ালা থাকবে। আপনি একটি মোম বাতি হাতে ক'রে ষ্টেশনে গিয়ে তাদের খুব সাবধানে নিয়ে আসবেন বাসায়।"

সত্যিই এল তিনজন লোক। একজন ছিপছিপে, লম্বা, ময়লা রং, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, - চোখে চশমা—বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাইশ। অপর দু'জন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। ফ্রেঞ্চকাট সরাসরি রণেশের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনি কি কর্তার বাড়ী থেকে আসছেন?" রণেশ শুধু হাসল। আগন্তুকদের নিয়ে সে চলে এল বাসায়।

এরপর থেকেই বাসা সরগরম। প্রায় প্রত্যহই দু'একজন অপরিচিত লোক বাসায় আসে। মাঝে মাঝে রণেশকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিয়ে যেতে হয় ষ্টেশনে,—আবার কাউকে কাউকে পৌছিয়েও দিতে হয় সেখানে। পাকশাক নিজেদেরই করতে হয়,—অবশ্য তা' একদম সাদাসিদে গোছের। ডাল আর ভাত, যদি একটা ভাজা বা একটা তরকারী থাকে, তবে তো সেদিন নেমন্তন্নের খাওয়া। বাসায় কুয়ো নাই। জলের কল থেকে রাতে আট-দশ কলসী জল আনা হয়,—তাতে পাকশাক ও খাওয়া চলে, স্নান সকলের হয় না। তাই লটারী ক'রে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদিন যার নাম উঠল—পরের দিন তার নাম বাদ দিয়েই লটারী করা হয়।

একদিন বাসার লোক সংখ্যা হ'ল আট। একজন বাহিরের ঘরে পাহারায় থাকল। সাতজন বসল খেতে, খবরের কাগজ হ'ল আসন। মাঝখানে ভাতের হাঁড়ি আর মাছের ঝোলের কড়াই,—দুপাশে দুখানা এনামেলের থালার পাশে বসে গেছে সাতজন। কাছেই গুলীভরা চার-পাঁচটি রিভলভার কাগজ দিয়ে ঢাকা। ফ্রেঞ্চকাট বলে উঠলেন—

"সাবধান, যেন একের হাত অন্যের মুখে না যায।" সকলে হেসে উঠতেই তিনি বললেন—"আস্তে।"

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দও সংযমের চাপে আধমরা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জীবন এতে হাঁফিয়ে ওঠে,—কিন্তু এদের জীবনের গতি অতি বিচিত্র। দুর্জয় সংকল্প এদের মনে—প্রকাশ তার বিঘ্নবহুল কর্মে—ভাষায় নয়। এরা যেন কর্মময় বোবারাজ্যের বাসিন্দা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, শঙ্কা, সংশয়, কিছুই যেন এদের মনে রেখাপাত করে না।

মাছ হয়েছে সেদিন। মণী রায় ওরফে রণেশ মৎস্য আহারে কৃতিত্ব দেখিয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিল। চাকা চাকা মাছ পুরে মুখে—আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই মুখ থেকে টেনে বের করে কাঁটা কয়টি ঠিক যেন আখমাড়াই কল—রস ভেতরে যায়, আর ছোবড়া বেরিয়ে আসে। সকলেই অবাক্ হয়ে দেখছে কাণ্ডখানা—হঠাৎ ফ্রেঞ্চকাট রণেশের হাত চেপে ধরে বললেন—"থাক থাক, ঢের হয়েছে, বন্ধু। আমরাও কিছু খেতে চাই।" আবার হাসাহাসি।

সেইদিন থেকে ফ্রেঞ্চকাট রণেশকে বন্ধু বলে ডাক সুরু করলেন - রণেশও তাকে বন্ধু বলে ডাকতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা দেখা দিল। ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলে মাঝে মাঝে—আবার তর্কাতর্কিও হয়।

একদিন ফ্রেঞ্চকাট রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। রণেশ কবিতার ঘোর বিরোধী; বলে উঠল—"খোল-করতাল আর কবিতা—এই দু'টিই করেছে বাংলার সর্বনাশ। যে দেশে চাই বীর্যবান্ যুবশক্তির উদ্দাম জাগরণ, সেখানে এই সব কবিতার ভাবালুতা এনে দিয়েছে তন্দ্রার আবেশ। ঝেঁটিয়ে দূর কর একে দেশ থেকে। স্বামীজী সত্যিই বলেছেন—"তোদের দেশে কি জয়ঢাক নেই—তূরী-ভেরী নেই?"

এরপর সুরু হল বিষম তর্ক। রণেশ প্রমাণ করতে চাইল বিপ্লবীর

পক্ষে কবিতা পাঠ রীতিমত অপরাধ। ফ্রেঞ্চকাট রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আবৃত্তি করে তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে গেলেন। রণেশ আরও চটে গিয়ে বলে উঠল—"আপনি একটি অপদার্থ লোক,—বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হওয়াই আপনার উচিৎ ছিল। এই ভীষণ পথে আসা আপনার ভুল হয়েছে। তার উপর যারা আপনাকে ফেরারী করেছে, তাদের ভুলও মার্জনার অতীত।"

এরপর থেকেই বন্ধুর সম্বন্ধে বড হীন ধারণা রণেশের মনে জমাট হয়ে উঠতে লাগল। অপদার্থ লোকটী—সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয—কোথাও নড়তে চড়তে চায না। একদিন সে কর্তাকে বলেই বসল—"এসব লোককে কেন ফেরারী করা হয়েছে? কিছুই করে না যে! দিনরাত ঘুম—আর জাগলেই একে ওকে তাকে খোঁচা মেরে কথা,—টিপ্পনী। সকলে রাতে পাহারা দেয—ও কেন ঘুমুবে? ওকে পাঠিয়ে দিন না বাড়ীতে।"

কর্তা হেসে বললেন—"তাই তো! বড়ই ভুল হয়েছে ওকে এনে। আচ্ছা দেখি, কি করা যায।"

কয়েকদিন পরের কথা। বিকেলের দিকে ফ্রেঞ্চকাট পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বড়ই বিষণ্ণ চিত্তে। রণেশ তাকে জিজ্ঞাসা করলে —"এত গম্ভীর কেন, বন্ধু?"

বন্ধু নিরুত্তর। পরে অনেক পীড়াপীড়ির পর বললেন—"কারো কাছে বলো না বন্ধু।—আমার মন আজ বড খারাপ—বাড়ীর কথা চিন্তা করে। স্বপ্নে দেখেছি ছোট বোনটির অসুখ।"

রণেশ মনে মনে শঙ্কিত হল। এই প্রকার দুর্বলচিত্ত লোককে কোন কারণেই উচিৎ হয়নি ফেরারী করা। এতে দলের সর্বনাশ হতে পারে। সান্ত্বনার সুরে বলল—"স্বপন নিয়ে মাথা ঘামাতে আছে? পাগল আর কি!"

তারপর দলের নেতা নলিনী ঘোষের দৃঢ়চিত্ততার কাহিনী শুনিয়ে বন্ধুর মনে শক্তি সঞ্চারের প্রয়াস পেল রণেশ।---

"আমাদের নেতা নলিনী ঘোষ—যার ডাক নাম রাজেন বাবু—তার উপর চলেছে অমানুষিক উৎপীড়ন,—দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে torture করে তার চোখে জল আনতে পারেনি।--মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে তাঁকে,—তাঁর সেলের মধ্যে রাতে সুন্দরী মেয়েমানুষ রেখে তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে চেয়েছে,—অবশেষে পিশাচেরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দালান্দা হাউসের ষোলজন প্রহরীর মাঝ থেকে পালিয়ে নলিনী ঘোষ প্রমাণ করে দিয়েছেন বিপ্লবীর মানসিক ও দৈহিক গতি দুর্জয়,—দুর্বার।"

অতিশয় বিস্ময়ের সাথে ফ্রেঞ্চকাট জিজ্ঞাসা করলেন—"বন্ধু, দেখেছ তুমি নলিনী ঘোষকে?"

রণেশ উত্তর দিল, —"একদিন আঁধার রাতে দেখেছিলাম রাজেন বাবুকে। তাঁর গ্রেপ্তারের পর জেনেছিলাম রাজেনবাবুই নলিনী ঘোষ। বন্ধু। চেষ্টা কর তাঁরই মত হতে,—মনে বল পাবে।"

সেদিন ফ্রেঞ্চকাটের কোন আপত্তি না মেনে রণেশ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার মন বিরক্তিতে ভরে গেল। ফ্রেঞ্চকাট কেবলই বলে—"চল বন্ধু। বাসায় ফিরে যাই।" অগত্যা বাসায়ই ফিরতে হল। কিন্তু ফেরার সময় পথের মাঝে অনাবশ্যক দেরী করতে লাগল এই অপদার্থ লোকটি। রাস্তায় কেবলই এপাশ-ওপাশ করে—আর মোড়ে মোড়ে প্রস্রাব রণেশের মনে সন্দেহ হতে লাগল—কোন ব্যারাম নাই তো? যে রকম চেহারা, চাল চলন,—অসম্ভব নয়

সেইদিন রাতেই সে কর্তাকে বন্ধুর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার

কাহিনী সবিস্তারে জানাল ;—এও বলল—"আর বেশীদিন একে এখানে রাখলে বিপদ হবে। সুতরাং একে বিদায় দিয়ে বাসা পরিবর্তন করাই সঙ্গত।"

কর্তা চিন্তিতভাবে বললেন- "তাই তো। সম্ভবই একটা কিছু করতে হবে।"

ইতিমধ্যে নৃপেন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জ্বর আটদিন ছাড়ে না। ফ্রেঞ্চকাট তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। অবশেষে কর্তাকে বললেন একজন ডাক্তার ডাকতে। পাশাপাশি দুটি কামরার দুয়ারে পর্দা ঝুলান হল। ডাক্তার আসার ঠিক আগে ফ্রেঞ্চকাট রণেশকে ভিতরের কামরায় নিয়ে গিয়ে কয়েকখানি কাঁচের চুড়ি স্যুটকেশ থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—"এগুলি পরে নাও, বন্ধু।"

"বকামো রাখ! অপদার্থের ডেঁপোমি ঢের হয়েছে!" রাগতস্বরে এই বলে রণেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখে—তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—"নাও, আর দেরী করোনা।"—এই স্বর, এই দৃষ্টি রণেশের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বিমূঢ়ের মত সে চুড়ি হাতে পরে নিল। শান্তকণ্ঠে বন্ধু তাকে বল্লেন—"ডাক্তার এলে চুড়ির শব্দ করবে"—এইবার রণেশ এর প্রয়োজন অনুধাবন করলে। তারপর ডাক্তার এলো,—তার সাথে ফ্রেঞ্চকাট অসুখ সম্বন্ধে যে আলাপ জুড়ে দিলেন, তাতে রণেশের কিছুমাত্র সংশয় রইল না যে—তার বন্ধু চিকিৎসা শাস্ত্রে কিছু দখল রাখেন। ডাক্তার চলে গেল,—সুরু হল যমে-মানুষে টানাটানি। ফ্রেঞ্চকাট যেভাবে শুশ্রূষা করতে লাগলেন দিনরাত, তাতে রণেশের মন থেকে তাঁর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার ভাব ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। কিন্তু, এই অনুকূল ভাব স্থায়ী হবার অবকাশ পেল না। একদিন ফ্রেঞ্চকাট রণেশের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন—'বন্ধু! এখানা পোষ্ট করে দিও, কেউ যেন না জানে।

বোনের কাছে লিখছি—কর্তার কাণে যেন না যায়।"

সর্বনাশ। দুর্বলচিত্ত লোকের কৃতকর্মে হয়ত দলের ভরাডুবি হবে। রণেশের মনটা তিক্ততায় ভরে গেল—ভাবটি প্রকাশ পেল তার চোখে মুখে। কিছু না বলে সে চিঠিখানি পকেটে রেখে দিল এবং কর্তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—"দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ইনি বাড়ীতে চিঠি লিখেছেন—একেবারে কাঁচা ফেরারী। এখনও জানে না এইরকম চিঠি থেকেই সমস্ত বিপদ আসতে পারে। আর মনের দিক দিয়েও তো এটা তাঁর অযোগ্যতাই প্রমাণ করে।"

"থাক্ চিঠিখানা আমার কাছে—দেখিয়ে দিচ্ছি মজাটা।"—বলে কর্তা পত্রখানি পকেটে রাখলেন।

* * * *

কে কোন্ জেলার লোক—মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে ফেরারীদের মধ্যে কৌতুককর গবেষণা চলত। একদিন ক্রেঞ্চকাট রণেশকে বললেন—"পাঁপর ভাজার গন্ধ যাবে কোথায়? বন্ধু। তোমার কথা থেকেই বুঝতে পারছি যে তুমি ঢাকার লোক।"

এইবার রণেশ রাগে ফেটে পড়ল।—"কেন পরিচয় জানার জন্যে এত অন্যায় আগ্রহ। আজ এখানে থাকত যদি নলিনী ঘোষ তো চাবকিয়ে তোমায় লাল করে দিত।"

উপেক্ষাভাবে বন্ধু জবাব দিলেন—"ওঃ—ভা—রি তোমার বড় অর্গানাইজার নলিনী ঘোষ। ও আমাকে লীডার করলে আমিও তার চেয়ে ভালই কাজ চালাতে পারি।"

এবারে রণেশ ভদ্রতার সীমাও ছাড়িয়ে গেল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বন্ধুর মুখের কাছে ধরে মুখ ভেংচিয়ে বলল—"তুমি পার এই কলাটি! তুমি দিনরাত কেবল ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতেই পার! তুমি নলিনী ঘোষের জুতোর হাফসোলের যোগ্যও না।"

এরপর থেকে রণেশ বন্ধুর কাছে বড় একটা ঘেঁসে না। এই অপদার্থ লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপ আর মোটেই সহ্য হত না। বলে কিনা নলিনী ঘোষের সমান হতে পারে। ইতরটাকে দলে জুটাল কে? কর্তাই বা কেন জেনে শুনে একে এখানে এতদিনও রেখেছেন?

রোগীর শুশ্রূষায় যে শ্রদ্ধা তার মনে দানা বেঁধেছিল তার স্থানে জমা হল অপরিসীম ঘৃণা।

*   *   *   *

কয়েকদিন পরের ঘটনা। শীতের রাত। চারজন ফেরারী কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কয়েকদিন আগে এসেছেন একজন—সকলে ডাকে বড়দা বলে। সুন্দর চেহারা—দেখলেই ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁর পাশেই শুয়ে ফ্রেঞ্চকাট। শেষরাতের পাহারা, মণী রায় ওরফে রণেশ জানালা ঈষৎ ফাঁক করে চুপচাপ বসে আছে,—আর মাঝে মাঝে বড়দা ও বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখছে। মনে তার খেলছিল তুলনামূলক বিচার। একজন ফর্সা—আর একজন কালো। একজন হৃষ্টপুষ্ট—আর একজন হ্যাংলা-ক্যালা। একজনের চেহারায় মনে জাগে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম—অপরের চেহারায় আনে বিরক্তি। কিন্তু ওকি। একদল লোক যেন ওভারকোট গায়ে দিয়ে বাসার দিকে আসছে। কাছেই ছিল ফ্রেঞ্চকাট ঘুমিয়ে,—তাকে ধাক্কা দিয়ে রণেশ বলল—"বন্ধু। পুলিশ—"

তড়াক্ করে তিনি উঠে পড়লেন—জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝলেন সমূহ বিপদ। চকিতে সকলকে জাগান হল,—ততক্ষণ পুলিশদল দুয়ারের কাছে এসে পড়েছে

বাহির থেকে দুয়ারে পড়ল ধাক্কা—পুলিশদলের নেতা ফেয়ারওয়েদার সাহেব হেঁকে বল্লেন—"দুয়ার খোল, নয় ভেঙ্গে ঢুকব।"

ফ্রেঞ্চকাট এগিয়ে গেলেন,—বজ্রকণ্ঠে জবাব দিলেন—"সাধ্য থাকে চেষ্টা কর—তারপর মর।" সঙ্গে সঙ্গেই তার রিভলভার উঠল গর্জে—

গুড়ুম — গুড়ুম—

সঙ্গে সঙ্গেই ফিলসফার আব প্রবোধ দাসগুপ্ত ওরফে দাস্থ বন্ধুর দুপাশ থেকে সুরু করে দিলে গুলীবর্ষণ। পুলিশদল গেল পিছিয়ে—দূর থেকে তারা চালাতে লাগল বাইফেল। রাইফেল ও রিভলভারের শব্দে নিশাবসানের নিস্তব্ধতা গেল ভেঙ্গে; গৌহাটির অতি শান্ত নিভৃত অঞ্চলে সুরু হল আগুনের হোবি খেলা;—বিস্মিত নরনারী নিদ্রাভঙ্গে ভেবেই পেল না—অকস্মাৎ কেন এই বজ্রপাত। রণেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে যায় বন্ধুর ক্ষিপ্রকারিতা, দেখে তার সাহস, দেখে তার দৃঢ়তা। একি সেই বন্ধু যাকে এতদিন ভেবেছে সে অপদার্থ জড়ভরত? বাঁশের বেড়া ভেদ করে অবিবাম চলেছে শাঁই শাঁই গুলী—বাইফেল ও বিভলভাবের গর্জনে সারা সহর হল মুখরিত। কখন যে একটি গুলী এসে বিদ্ধ করেছে রাজসাহীব প্রভাস লাহিড়ী ওবফে ফিলসফারের উরুদেশে, খেয়ালই নাই তার। বড়দা বল্লেন—"ওকি, রক্তে যে তোমাব সারা কাপড় ভিজে গেছে।" বিস্মিত নেত্রে প্রভাস দেখল চেয়ে—এইবাব তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। সহসা বন্ধু বলে উঠলেন—"গুলী নাই—কার্টিজ শেষ, মাত্র ছয়টি আছে প্রস্তুত হও বন্ধুগণ। আমি তোমাদের দেব না ছেড়ে পুলিশের হাতে,—বিপ্লবীর দেহ পাবে তারা—কিন্তু প্রাণহীন দেহ।"

বন্ধু দাস্থর দিকে তাক্ করে রিভালভার উঁচিয়ে ধরলেন—প্রভাস বুক উঁচু করে দাঁড়াল দাস্থকে পেছনে ঠেলে। চক্ষের নিমিষে সব হয়ে যাবে শেষ,—ভাস্কর পণ্ডিত নিজহাতে দেবীর প্রতিমা দিবে অষ্টমীতে বিসর্জন। চকিতে বন্ধুর হাত চেপে ধরলেন বড়দা,—বললেন—"মৃত্যু নয়,—বাঁচতে হবে আমাদেব···· ·আগুনের মন্ত্র নিয়ে ছুটতে হবে দিকে দিকে। পুলিশেব বেষ্টনী অসম্পূর্ণ—পেছনের পথ নিরাপদ। পালাও··· পালাও···"

বন্ধু বললেন—'তবে তাই হোক্—পালাও সকলে, আমি মোহড়া নিচ্ছি।' বন্ধুর রিভলভার আবার উঠল গর্জে,—বড়দা অর্থাৎ শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর তিনজন নিঃশব্দে আঁধারের আবরণে বেরিয়ে এল পথে। রণেশ ভাবে—কে এই বন্ধু।—

কয়েকদিন পরের কথা। স্পেশাল ট্রিবিউনালের কাঠগড়ায় রণেশ এই প্রথম দেখতে পেল—শুধু সে-ই নয় ফিলসফার, ভাবাপ্রসন্ন দে ওরফে সুলতান, কর্তা এবং বন্ধুও ধৃত হয়ে বিচারের জন্য আনীত হয়েছেন। বন্ধু তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। প্রথমেই এল সনাক্তকরণের পালা। একজন বড়দরের গোয়েন্দা কর্মচারী এসে কর্তার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল—"ইনি হচ্ছেন কাশী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী, শচীন সান্যালের সহকারী নরেন ব্যানার্জি।" তারপর সে বন্ধুটিকে দেখিয়ে বলল—"আমি এঁকে সনাক্ত করছি। ইনি হচ্ছেন অনুশীলন সমিতির নেতা—প্রায় দেড় বছর আগে দালান্দা হাউস থেকে পালিয়েছেন—নাম নলিনী ঘোষ।"

নলিনী ঘোষ? বন্ধু নলিনী ঘোষ? রণেশের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—তার আর শক্তিই রইল না দাঁড়িয়ে থাকার,—বিমূঢ়ের মত সে বসে পড়ে—জড়িতস্বরে বলল—"বন্ধু তুমি—আপনি নলিনী ঘোষ—"

বন্ধু তাকে উঠিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"তুত্তোর নলিনী ঘোষ! আমি বন্ধু।"

চপল-রুদ্র

আসামের শেষপ্রান্তে নাহোরকাটিয়া ষ্টেশন,—একেবারে তিনসুকিয়ার কাছাকাছি। ত্রিপুরা জেলার এক ভদ্রলোক সেখানকার ষ্টেশন মাষ্টার। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় দুইটি ছেলে এসে উপস্থিত হল। একজনের নাম চপলাকান্ত রায়,—আর একজনের নাম রুদ্রনাথ চৌধুরী। চপলার বয়স ষোল-সতের—রুদ্রনাথের কুড়ি-একুশ। পরিচয়ে জানা গেল চপলা মাষ্টার মহাশয়ের ভাগনে—আর রুদ্রনাথ মাসতুতো ভাই। উভয়ে খুব গরীব—আর্থিক অনটনে পড়াশোনা হ'ল না—তাই এসেছে এখানে টেলিগ্রাফী শিখতে,—মাষ্টার মহাশয়ের চেষ্টায় যদি রেলের চাকুরীতে ঢুকতে পাবে। ষ্টেশনে মাত্র তিনজন বাঙ্গালী কর্মচারী। আশেপাশের চা বাগানগুলিতে, পোষ্টাফিসে, ডাক্তারখানায় ও দূরে থানায় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী আছে। চপলা ও রুদ্রের আগমনে ষ্টেশনের আড্ডাটা বেশ একটু দানা বেঁধে উঠল। হৈ হল্লা ত আছেই—তার উপর বৈকালে ব্যাড্‌মিণ্টনও সুরু হয়ে গেল। ছেলে দু'টি যেন প্রাণরসে ভরপুর,—চুপচাপ বসে থাকে না। একটা না একটা করেই চলেছে আপন মনে। এরই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নাহোরকাটিয়া চা-বাগানের সাহেব-ম্যানেজার মিঃ জনষ্টনের ঘোড়া চরছে ষ্টেশন-সংলগ্ন মাঠে। চপল বললে—"রুদ্রমামা! ধরুন না একটু প্র্যাক্‌টিশ করে নিই!" আর যায় কোথায়। রুদ্র ঘোড়া ধরে—পায়ের ছাঁদ খুলে লাগাম বানিয়ে নিল এবং চড়ে বসল তার পিঠে। ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। একবার সে—একবার চপল। পালা করে ঘোড়দৌড় চালাতে লাগল তা'রা। ওধারে সাহেব খবর পেয়ে বেরিয়ে এল হাণ্টার নিয়ে। তখনকার দিনে চা-বাগানের সাহেব যে কালা-আদমীর পক্ষে কৃতান্তের যমজ ভাই এখবর বোধ হয় বেচারারা রাখত না। দূর থেকে সাহেবের চীৎকার

"পাকড়ো", "পাকড়ো" শুনেই ওদের চমক ভাঙ্গল। একলাফে ঘোড়া থেকে নেমেই দুজনে ছুটল ষ্টেশনের দিকে।—পিছে পিছে ধেয়ে আসছে অগ্নিশর্মা জনষ্টন: একদৌড়ে ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল চপল। সাহেবও হৈ হৈ করে ষ্টেশনে উপস্থিত। মাষ্টার-মশাই ষ্টেশনেই ছিলেন—গোলমাল শুনে হাজির হলেন সাহেবের সামনে। ব্যাপার শুনে ভদ্রভাবে বললেন—"ছেলে দুটী আমার আত্মীয়। না জেনে শুনে করে ফেলেছে অন্যায়"—

সাহেব এবার কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন—"ওদের নিয়ে এস আমার সামনে।"

চপল ও রুদ্র আসতেই সাহেব সুরু করলেন উপদেশ,—"অবল জানোয়ারকে কষ্ট দিতে নেই, বুঝলে ?"

সাহেব চলে যেতেই চপল হেসে বললে—"এই জন্যই বুঝি চা-বাগানের সাহেবেরা বোবা জন্তুদের কষ্ট দিয়ে থাকেন। বেটা আর একটু এগুলেই দেখিয়ে দিতাম মজাটা।" রুদ্র তাকে ধমক দিয়ে বললে—"থামো। বাসায় চল।" মাষ্টার মশায়ও ওদের পিছে পিছে চলে এলেন কোয়ার্টারে। এসেই বুঝলেন চপল সাহেবের সম্মুখে এগিয়েছিল সশস্ত্র,—রিভলবার পকেটে নিয়ে। মুহূর্তমধ্যে এমন অঘটন ঘটে যেত যাতে নিভৃত অঞ্চলের শান্ত পরিবেশ কম্পিত হত প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। অতি শান্ত ভাবেই তিনি রিভালভারটি চপলের কাছ হতে নিয়ে বাক্সে বন্ধ করে রাখলেন।

চপল বললে—"ওকি করেন? নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র চাই যে আমাদের।"

হেসে মাষ্টার বললেন—"অর্থাৎ বাজারে মেছুনীর সাথে দাম নিয়ে বচসা করে তাকে বসিয়ে দেবে গুলি। ওটা এখন থাক আমার কাছে।"

চপল ভারী ক্ষুণ্ণ হল মনে মনে। রুদ্রও গেল চেপে। দুজনে টেলিগ্রাফের যন্ত্র নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে শিখে যায়—টরে টক্কা—টক্কা টরে। কয়েকদিন অধ্যবসায়ের ফলে তারা কিছু কিছু শিখেওছে। একদিন

চপল মহা উৎসাহে মাষ্টার মশায়কে বললে—"মাষ্টার মামা—দেখুনতো কলে কি যেন বলে।—আমি পাঠাচ্ছি মেসেজ—আর বরদুপি ষ্টেশন থেকে কেবলং বলছে—"F—L" "G. T. F"—এসবের অর্থ কি?"

মাষ্টার মশায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে তার-বাবুকে ডেকে বললেন—"দেখুন তো দেবেনবাবু—এতো বড মজাব কথা—বুঝিয়ে দিন চপলকে।"

দেবেনবাবু হেসে বললেন—"তাই নাকি "F L, বলছে? আবার G. T. F? এর অর্থ হচ্ছে—Fool—go to the field. অর্থাৎ অরে বেকুব, সিগন্যালিং ছাইডা হলকর্ষণ কব্!"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

এইভাবেই হাসিঠাট্টার মধ্য দিযে দিন কাটছে তাদের। মাঝে মাঝে রুদ্র ও চপল বেব হয ভ্রমণে। জঙ্গলেব পর জঙ্গল পার হয়ে যায তারা। কোথাও দেখতে পায দূবে নদীর ওপারে বুনো হাতী জঙ্গলের ডালপালা মড্মড্ করে ভেঙ্গেচুরে আসছে নদীর ধারে,—প্রাণভয়ে হরিণেব দল ছুটে পালাচ্ছে। অহমীয়ারা সাবধান করে দেয, বলে—"এ ডাঙ্গুরিযা! লাহে লাহে ফিরি যোযা ঘরত—হাতী ওলাইছে—না যোযা ঐ ধাবত।" ফিসে আসে তারা। এইরূপে নাহোর-কাটিযাব দশ মাইল পবিধি তাদের পবিচিত হযে পডেছে। কখনও কখনও তারা ডেহিং নদীতে নৌকা চালায—অগভীর পার্বত্য নদীর স্রোতের টানে ভেসে যায বহুদূর। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে দেখা যায নদীর তলে মোটা মোটা বালির দানা.—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথবেব টুকরো। দেখা যায় রং-বেরংযের চাঁদা মাছ, মহাশোলের পোনার ঝাঁক ছুটে পালাচ্ছে দাঁড়ের শব্দে। ওপারে কোথাও দেখা যায় বাঘ এসেছে নদীব ধাবে,—একজাতীয় বানর কেবলই—হুক্কু—হুক্কু—ববে ডাকতে থাকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত হযে রুদ্র ও চপল সন্ধ্যায ফিরে বাসায়,—চাপায রান্না। নৈশ ভোজনের পর অনেক রাত

পর্য্যন্ত উভয়ে পড়াশোনা করে। এই ত তাদের দৈনন্দিন কার্যসূচী। ভাল লাগে না চপলের এ জীবন। কৃতী ছাত্র ছিল সে। স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকর্ষণ। সমাজকে ভালবেসে নির্বাসিত হয়েছে সমাজ জীবন থেকে। কর্মের প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠে সে ক্ষণে ক্ষণে। রুদ্রের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলে সে—"কর্মহীন বিজন সাধনাতেই কি হবে এ জীবনের সমাপ্তি? কাজের জন্যই ছাড়লেম সংসার—ফিরেও চাইনি আত্মীয় স্বজনের দিকে—নিজের দিকে। কিন্তু কবে পড়বে ডাক কাজের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার,—প্রত্যাশায় আর কতদিন অতিবাহিত করব?"

রুদ্রের মনেও সেই একই বেদনা। দালান্দা হাউস থেকে পালিয়েছে সে,—নির্যাতনের ভয়ে নয়—কর্মের প্রেরণায়। তবু সে প্রবোধ দেয় চপলকে। বলে—"চঞ্চল হলে চলবে না তো ভাই। আসামের শেষ প্রান্তে একান্ত নিরাপদ স্থানে পার্টি রেখেছে আমাদের পাঁচ সাতজনকে রিজার্ভ হিসাবে। যদি কেন্দ্রে ঘটে কোন বিপদ, যদি অতর্কিত আক্রমণে কেন্দ্র হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন—সেইদিন পড়বে আমাদের কাজ। সারা ভারতের সাথে যোগাযোগের সন্ধান তাই গচ্ছিত আছে আমাদের কাছে।—পার্টির সেই দুর্দিনে যোগসূত্রের সাঙ্কেতিক ঠিকানা সেইদিন উদ্ধার করব আমরা,—তারই সাহায্যে আমাদেরই করতে হবে দলের শাখা প্রশাখার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন। সেই সাঙ্কেতিক সংযোগ যখের ধনের মত পাহারা দিয়ে বসে আছি পার্টিরই প্রয়োজনে। তাই আমাদের কর্মবিহীন বিজন সাধনা বরণ করে যে নিতেই হবে ভাই।" চপলের মন কতকটা হাল্কা হয়ে আসে। আবার স্ফূর্তি পায় তার উচ্ছল সজীবতা স্বাভাবিক ধারায়।

একদিন চপল পায়খানায় গিয়ে দেখে যে চকখড়ি দিয়া লিখা আছে— "আরামের স্থান।" বুঝে নিল সে, যে বিকৃত হরফে হলেও লেখাটি

রুদ্রের। তৎক্ষণাৎ তার তলায় চপল লিখে দিল—"কিন্তু আমাশয়ে নহে।"

মাষ্টার মহাশয় পায়খানায় গিয়েই হো হো করে হেসে উঠলেন,— একদম ছেলেমানুষ সব।

এরই কয়েকদিন পরের কথা। ষ্টেশনের কাছাকাছি একটি বুড়ো অহমীয়া Back shunting এর সময় ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। তার একখানি পা কাটা পড়েছে,—রক্তে রক্তারক্তি।

খবর পেয়েই রুদ্র ও চপল ছুটল সেখানে। লোকটি তখনও বেঁচে আছে—কিন্তু সংজ্ঞাহীন। দুজনে লেগে গেল তার পরিচর্যায়। দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আহত বৃদ্ধের সংজ্ঞা ফিরে এল। ক্ষীণস্বরে সে বলে উঠল—"মৈ আরু ন বাঁচিম। ঘরত মোর পোয়ালীর কি হইব হে ভগমান।" তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চপলের চোখেও জল—রুদ্রের চোখও ছল ছল করে উঠল। সত্যিই বুড়োটা মারা গেল। উভয়ে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেল বাসায়। কয়েকদিন ধরে কেবলই বুড়োর কথা, তার চোখের জল তাদের মনে ভেসে ওঠে,— অপসারিত হতেই চায়না বিষাদের ছায়া। মাষ্টার মশায় তা' লক্ষ্য করলেন- হেসে বললেন—"বিপ্লবীর মন এত কোমল।"

রুদ্র চমকিয়ে উঠল সত্যিই কি? তাই তো! এই ভাবকে তো আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চপলের সাথে ফিস ফিস্ করে সে কি যুক্তি করল। পরের দিন মাষ্টার মশায় যখন ডিউটীতে গেছেন, তখন তারা একটা কুকুরের দুটী পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল একটি গাছের সাথে। তারপর দু'জনে দুখানা চাবুক নিয়ে কুকুরটীকে বেদম "সপাং" "সপাং" লাগিয়ে চলল। কুকুর বেচারা নিশ্চয় বুঝতে পারেনি যে দুইজন ভীষণ বিপ্লবী তারই মারফতে কোমল প্রাণ দৃঢ় করে নিচ্ছে। পারলে হয়ত সে এই দুর্দান্ত বৈপ্লবিক আতিশয্যে প্রতিবাদ না জানিয়ে

নীরবেই সহ্য করত এই অত্যাচার দেশপ্রেমের আঙ্গিক হিসাবে কিন্তু বেচারা কুকুর এই সব গভীর তত্ত্বনিচয় জানবে কোথা থেকে? তাই সে "কেউ, কেউ" রবে তার অসহায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো ক্রমাগত। চপলের মনে যদি দয়া হয়—রুদ্রের কাছে সে খেলো হবার ভয়ে সমানেই চালায় চাবুক। অবশেষে নির্যাতিতের রোদন আকর্ষণ করল ষ্টেশনের কর্মচারীবৃন্দের মনোযোগ। সকলে সরজমিনে গিয়ে তাজ্জব বনে গেল ব্যাপার দেখে। ঢাকাই তার-বাবু তারস্বরে বলে উঠলেন—"ক্ষ্যাপ্ ছে—নিচ্চয় ক্ষ্যাপ্ ছে। মাষ্টারবাবু! আরে খ্যাহেন কি—এগো বাইন্ধ্যা বহরমপুরে পাঠান।"

মাষ্টার মশায়ের ধমক খেয়ে রুদ্র ও চপল রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেল বাসার মধ্যে। হয়তো বা তাদের হৃদয় আধা দৃঢ় হয়েই রইল—কে জানে।

কয়েকদিন পরের কথা। দুর্গা পূজা এসে পড়েছে। প্রতি বৎসর নাগোরকাটিয়ায় যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন তাদের উদ্যোগেই সমারোহে দুর্গা পূজা হয়। এবারও তারি উদ্যোগে ডাকা হয়েছে বাঙ্গালীদের মিটিং। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরেই বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। দুপুর বেলা। চা বাগানের বাবুরা, ডাক্তার, পোষ্ট মাষ্টার, দুই একটি ব্যবসায়ী অনেকেই এসেছেন। থানার দারোগাবাবু,—সার্কেল ইনস্পেক্টরবাবুও এসেছেন। ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাষ্টারের কোয়ার্টার। ঝিরঝিরে হাওয়ায় রুদ্র পড়েছে ঘুমিয়ে,—চপল তার পাশেই বসে। আড্ডা জমে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলার বিপ্লবীদের কথাও আলোচনা হচ্ছে। ইনস্পেক্টরবাবু পুলিশের বড় অফিসর। পদাধিকার বলে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দাবী সবচেয়ে বেশী তাঁরই। সুতরাং তিনি জোর গলায় বলে চলেছেন মন গড়ানো আজগুবি কাহিনী।

"বসন্ত চাটুয্যের murder? আমি সেদিন কোলকাতায়। মাঠে

খেলা দেখতে যাব—চৌরঙ্গী ক্রশ কচ্ছি—এমন সময় এক বেটা খোঁড়া—বসন্ত চাটুয্যের গাড়ীর সামনে লাঠি ধরে এসে "একটি পয়সা ভিক্ষে দিন বাবু"—বলে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। চাটুয্যে মশাই যেমনি বলেছেন—"হঠ যাও উল্লু কাহেকার"—অমনি মশাই বললে বিশ্বাস যাবেন না—ভিক্ষুকটি পিস্তল বের করে চেঁচিয়ে উঠল—"I murder Basanta Chatterjee for his crime against the country—"তারপরই গুড়ুম,—গুড়ুম—আমি তো দে ছুট—"

কাহিনী শুনে চপলের বুকটা ঢিব ঢিব করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে নিদ্রিত রুদ্র হঠাৎ ডান হাতখানি উচু করে বিড় বিড় করে বলতে লাগল—"রক্ত"—"রক্ত"—;—স্বপনের ঘোর।

পুলিশ ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের রক্ত রুদ্রবাবু ?"

সমস্ত বিপদ বুঝে চপল সকলের অলক্ষিতে রুদ্রের গায়ে লাগাল এক চিমটি। ফলে রুদ্র "উঃ" শব্দে সিধে উঠে বসে পল। ইনস্পেক্টরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের রক্ত রুদ্রবাবু ?"

জবাব দিলেন ষ্টেশন মাষ্টার।

"সেদিন ষ্টেশনে accidentএ লোকটা কাটা পড়ার পর প্রায় সাতদিন রুদ্র ভাল করে খায়নি—দিনরাত ঐ কথাই ভেবেছে—তাই স্বপনে দেখছে আর কি !"

খুব বাঁচিয়েছেন তো মাষ্টার মশায়। চপল মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এরই কিছুদিন পরে গৌহাটীর সহরে ও প্রান্তরে বিপ্লবীদের সাথে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর হল সংঘর্ষ,—সমগ্র আসাম কেঁপে উঠল এই অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণে। নাহোরকাটিয়ায় রুদ্র ও চপল তার আভাস পেল ট্রেন চলতি লোকের আলাপ আলোচনায়। শুনল তারা অহমীয়ারা বলাবলি করছে—"গৌহাটী ত ভারী কাণ্ড হৈ গৈছে। পুলিশর আক

মিলিটারী লোক গৈছিলো স্বদেশী দাকাত ধরিবলে—আরু দাকাতদল জেবর পরা পিস্তল ওলাই দম্ দম্ কবি পুলিশকে মাবি দিল্ ”

বসে গেল মন্ত্রণা সভা। কি কববে চপল আব কদ্র অবিলম্বে স্থির কবা প্রয়োজন। প্রকৃত ঘটনা কি তাও তো জানা নাই বাজেনবাবু, করতা, সুলতান, ফিলসফাব, স্কলাব সকলেই কি ধবা পডেছেন? যদি তাই হযে থাকে তবে তো সমিতিব এই দুর্দিনে সব গুছিযে নেবাব ভার তাদেরই। চলে যাবে তাবা বাংলাদেশে?

সন্ধ্যাব পবে অভাবনীয় ব্যাপাব ঘটে গেল। গৌহাটীব সমব ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে—দাসু অর্থাৎ প্রবোধ দাসগুপ্ত এবং স্কলাব ক্ষত বিক্ষত দেহে শতছিন্ন বস্ত্রে নাহোবকাটিয়ায় এসে উপস্থিত হল। গাইডিং-এব একখানি মাল-গাডীতে সাবাবাত কাটিয়ে ভোরেব আগেই ডেহিং নদীব অপর পাবে বিরাট জঙ্গলেব ভিতব দিযে এগিয়ে চলল তাবা চাবজন তিনসুকিযা অভিমুখে।

ভোবেব ট্রেনেই কিন্তু পুলিস এসে হাজিব। গ্রেপ্তাব কবল তারা ষ্টেশন মাষ্টাব শ্রীযামিনী দত্তকে। তাব-বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবল—“এখানে দুটী ছেলে ছিল একটী কালো আব একটী ফর্সা?”

অসন্দিগ্ধ তাব-বাবু জবাব দিলেন—“হ—আমাগো কদ্র আর চপলের কথা কন বুঝি—

মুখ ভেংচিয়ে আই, বি, ইনস্পেক্টর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—“আমাগো চপল আব কদ্র! জানেন তাবা কে? খুনী ডাকাত। একটি,—ঐ কালো বেটা হচ্ছে বসন্ত চাটুয্যের হত্যাকারী—প্রবোধ বিশ্বাস —দালান্দা হাউস থেকে নলিনী ঘোষেব সাথে পালিয়েছে। আব ঐ ফর্সাটা হচ্ছে অনুশীলনেব বালক নেতা, “স্বাধীন ভারতের” লেখক ছোট ফিলসফার, ও ব্যাটাও ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পালিযেছে পুলিশ পাহারার মাঝ থেকে। একেবারে বিচ্ছু শয়তান!”

প্রৌঢ় তার-বাবু অবিশ্বাসের সুরে হাসিমুখে বললেন—"কি যে কন্! আরে, ওগো তো আমি ছয়মাস ধইরা দেখত্যাছি,—একেরে পাগল। কুকুরের পায় দড়ি বাইন্ধ্যা চাবুক লাগায়,—রেলে মানুষ কাটা দেইখ্যা কাইন্দ্যা খুন,—হেবা আবার করব মানুষ খুন।—কিই যে কন্!"

অজর—অমর

ঢাকা জেলায় আবদুল্লাপুরে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গেছে। সকলের মুখে ঐ একই কথা। হাজার হাজার লোকের সামনে ডাকাতরা বাড়ী লুটে নিল,—তিনতুড়ি মেরে সিন্দুক ভেঙ্গে প্রচুর টাকা নিয়ে উধাও হল, অথচ একটী লোকও কোন কথা কইল না, —মোমের পুতুলের মত চুপটী করে বসে রইল সকলে। এ যেন ভোজবাজী।

আসলে ঘটনাটা এই। ১৯১৭ সালে পুজোর সময় আবদুল্লাপুরে এক ধনী মহাজনের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাত্রাগান হচ্ছে। মণ্ডপ বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনা লোক ভর্তি। মণ্ডপ ও সংলগ্ন ঘরের বারান্দা-গুলিতে মেয়েরা বসে গান শুনছে। গৃহস্বামীর ফরমাইশ মত নাটক হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ প্রজাপতি দক্ষ শিবের অপমান করেছেন,—অভিমানে সতী করেছেন দেহত্যাগ। নন্দীর মুখে বার্তা পেয়ে সংহারের দেবতা ধেয়ে এলেন দক্ষপুরে। সুরু হল শিবতাণ্ডব। দলে দলে ভূত, প্রেত আবির্ভূত হয়ে মার মার রবে যজ্ঞ পণ্ড করছে। অভিনয় উঠেছে জমে। এমনই সময় একটী বাঁশীর শব্দ,—আর সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হল আটজন যুবক সমগ্র আঙ্গিনাটী ঘিরে। মুখে তাদের মুখোস—পরিধানে

হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট। হাতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র। দর্শকবৃন্দ ভাবলে এ বোধহয় অভিনয়েরই এক দৃশ্য। কিন্তু মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। দেখল তারা আটটী পিস্তল গর্জে উঠল একসাথেই।--তারপর দলের নেতা এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় যুবক বললে—"যে যেমনটী আছেন তেমনই থাকুন—চলতে থাকুক অভিনয়--কোন ভয় নেই। যে ওঠার চেষ্টা করবে তাকে জীবন দিতে হবে" এই বলেই দস্যু নেতা রচনায় ঝুলানো একটি শশা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেন। গুলীবিদ্ধ হয়ে শশাটি ভেঙ্গে পড়ল মাটীতে। চিত্রাপিতের ন্যায় সকলে বইল বসে--গান চলতে লাগলো যথারীতি। ওদিকে অন্দরের লোহার সিন্দুকগুলি হাতুড়ির ঘায়ে গেল ভেঙ্গে। চল্লিশ হাজার টাকা লুটে নিয়ে সাব বেঙ্কে ডাকাতরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সর্দারটি বললেন—"গান যেমন চলছে তেমনিই চলতে থাকুক। আমাদের লোক রইল আসরেই। কেউ হৈ চৈ করলেই শাস্তি অনিবার্য।" সহস্রাধিক লোক যেন মন্ত্র-মুগ্ধ। কারো মুখে কথা নাই—কেউ ওঠেনা, হাত পা নাড়ে না—বোধশক্তি যেন লোপ পেয়েছে সবারই। ঘণ্টা খানেক এই ভাবেই কেটে গেল। হয়তো আরও সময় অতিবাহিত হত এই প্রকারে। কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গৃহস্বামী। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসে যুড়ে দিল হৈ চৈ—"ওরে আমার বুকডা ভাইঙ্গ্যা ফ্যাল্ছেরে—আমার মাথায় বাড়ি দিছে—মাইরা ফ্যালছে একেরে।" এরপরেই বিরাট হট্টগোল সুরু হয়ে গেল। ডাকাত দল কিন্তু নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে ততক্ষণ।

এই ঘটনার তিনচার দিন পরে বগুড়ার রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর বলে পরিচিত বিধুবাবুর বাসায় চার পাঁচজন যুবক এসে হাজির হল। সবাই ফেরারী—অগ্নিমন্ত্রের পূজারী। এদের মধ্যে দুইজন যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল—মনের স্ফূর্তি উপচে পড়ে তাদের সকল কাজেই। একজন গেল

পায়খানায—অপরজন পা টিপে টিপে গিয়ে তার সমুখ থেকে জলের মগটা নিয়ে দে ছুট্। পায়খানায় বসা বন্ধু বলেই চলেছে—"ফুল, রাস্কেল, বেয়াদব"—আর এদিকে হা-হা—হো-হো। অবশেষে সৌম্যমতি এক যুবা আবার পৌঁছে দিল মগ পায়খানায়।

বিকেলে একদিন দুইবন্ধু বাইরে রেললাইন ধরে গেছে ফাঁকা মাঠে। মন খুলে তারা আলাপ জুড়ে দিয়েছে। একজন বলছে—"এই ষ্টার। তবে আজ একডা কথা বলুম। তর আবদুল্লাপুরের অভিনয়ডা এমন সুন্দর হৈছিল্ যে তরে একডা ম্যাডেল দিতে মনে লয়।"

—"আর তর? আবদুল্লাপুরের প্লানডা তুই করছিলি—সেরেফ প্ল্যানের লাইগ্যা, তরও পাওনা সোনার ম্যাডেল। সাধে কি রাজেনবাবু "সর্দার" নাম রাখছে তর।" জবাব দিল ষ্টার। সদার (প্রফুল্ল রায) বলে—"জানস্ বাই! টাকার কুমীরগো মাইর‍্যা টাকা লওনে কুন দুষ নাই। কিন্তু রাত দুপুরে বন্দুক পিস্তল লইয়া ঘুম পরীতে হানা দ্যাওনে বাহাদুরী নাই এক ভোলাও। তাই ভাল লাগেনা আমার হে সব। আমি চাই গরম গরম মরদের বাচ্চার মত মর্দানি ফলামু,—তবে না? তাই করছি আবদুল্লাপুরের প্লান। হাজার হাজার লোক থাকব—তারি মধ্যে য্যাক্‌শান হইব। কি মজা! রাজেনবাবু তো প্লান মঞ্জুর কোরবই না—অনেক বুঝাইয়া তবে না মঞ্জুর করাইছি।"

বন্ধুর কথায় ষ্টারের মনের দোর খুলে গেল। সে বল্লে—"আমি দিনরাত কি স্বপন দেখি জানস্? য্যাক্‌শান, ট্যাক্‌শান না আমরা একেরে আক্রমণ করছি ফোর্ট উইলিয়াম। দলের সামনে আমি মশার পিস্তল হাতে লইয়া। হয় জয়—নয় মৃত্যু। ধ্যাযেরডাই আইব হেডাও জানি। কিন্তু সেডা হইব বীরের মরণ। বাঙ্গালীর পোলারা জনে জনে শিবাজী—তারা মরতে জানে বীরের মত, দ্যাখাইয়া দিমু আমরা। আমি যেনি দ্যাখতে পাই আমার মৃতদেহ, বৃটিশের গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হইযা

গ্যাছে—অজস্রধারায় রক্ত ঝরছে।"—বোলতে বোলতে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

"ত্য—এক্কেরে পাগল—ষ্টার!"—হেসে বলে সর্দ্দার।

"আরে পাগল না অইলে ঘর বাড়ী ছাইড়া আইমু ক্যান এ পথে?" জবাব দেয় ষ্টার।

বেলা যায় আঁধার ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। দুইবন্ধু ফিরে এল সহরে। বাজারে ঢুকে মুশুরীর ডা'ল, চা'ল, আলু, লবণ আর দু'আ'টি লাকড়ী কিনে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে তারা বাসার দিকে। বাসার কাছে যখন এসেছে তখন পেছু থেকে সর্দ্দার লাকড়ীর বোঝার গুতো লাগিয়ে দিল ষ্টারের গায়ে। অমনি সুরু হয়ে গেল মারামারি। ওয়ান্, টু, থ্রি বলার সাথে সাথেই যেন প্রতিযোগিতার আসরে লেগে পড়েছে দুটি লাঠিয়াল। দুজনের কোঁচড়ে বাঁধা-চা'ল, ডাল, আলু, লবণ; বাঁ হাতে লাকড়ীর আটী আর ডান হাতে আটী থেকে নেওয়া একখানি লাকড়ী ঢাল তলোয়ার দুয়েরই কাজ চালাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বাসায় বারান্দায় বসে চার পাঁচজন নেতৃস্থানীয় নামকরা বিপ্লবী। একজন পড়ছে ম্যাজিনীর আত্মজীবনী—অপর চারজন শুনছে তাই মন দিয়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় গেটের দুয়ার খুলে গেল।—সঙ্গে সঙ্গেই চারটি পিস্তল তাক্ করা হ'ল দোরের দিকে,—অতর্কিত আক্রমণের প্রতিরোধে বিপ্লবীরা প্রস্তুত।

"এইবার? এইবার দিছি তবে খুব একখানা—হৈচে—না আরো লাগব?" দোরের ওপার থেকে ভেসে আসে ষ্টারের কণ্ঠস্বর। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধরত অবস্থায় ষ্টার ও সর্দারের প্রবেশ। উভয়েকেই ডাক দিলেন মেজদা। কঠোরস্বরে বল্লেন—"খেয়াল নাই তোমাদের যে তোমরা ফেরারী? তোমাদের এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর এখনই ঘটে যেত প্রলয় কাণ্ড।

ষ্টারের গলা না পেলে হয়তো গুলী ছুড়তেম দোবের দিকে সবদা মনে রেখ—অসংযমী কখনো বিপ্লবী হ'তে পারে না।"

মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকল দুই বন্ধু। পরদিন মেজদা, সত্যেন, বিধুবাবু—সকলেই বগুড়া ছেড়ে চলে গেলেন। বাসায় রইলেন ষ্টার, নিকুঞ্জ পাল ওরফে কাননবাবু, গোবিন্দ কর ওরফে গোঁসাইজী এবং আরও দুই একজন। রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এমন সময় বগুড়ার ইন্‌চার্জ বিনোদবাবু একখানা চিঠি এনে দিলেন ষ্টারের হাতে। সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করে ষ্টার পড়লেন "কেন্দ্রে এসো—বিশেষ দরকার।" তিনি কাননবাবুকে বললেন চিঠিটা পুড়িয়ে ছাইটুকু গুঁড়িয়ে ফেলতে। কাননবাবু তাই করলেন। খানিকবাদে তিনি একখানি কাগজের টুকরো নিয়ে এসে দেখালেন ষ্টারকে। কাগজ-খানিতে কয়েকটা নাম সই করা আছে পেন্সিল দিয়ে। কাননবাবু বললেন—"কার সই জানেন? গুরুপদর। সে এখানে এসে কাগজ পেয়েই অন্যমনস্ক ভাবে নাম সই করে গেছে। খেয়াল নাই এ ফেরারীর বাসা। এখানে ওরকম অসাবধানতার অর্থ হচ্ছে গ্রেপ্তার ও পার্টির সর্বনাশ।" কাননবাবু পুড়িয়ে ফেললেন কাগজের টুকরোটি।

বেলা তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ সদর দোরের শেকল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। ষ্টার, কাননবাবু, গোঁসাইজী, বিনোদবাবু নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। নিমিষে সকলে প্রস্তুত হয়ে ত্বরিতপদে গেলেন খিড়কীর দোরে। খুলেই দেখেন একজন সি, আই, ডি, অফিসর্ রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তিনি রিভলবারটি উঠানোর অবসরও পেলেন না। ষ্টার, গোঁসাইজী ও কাননের পিস্তল থেকে গুলী এসে একযোগেই তাঁকে বিদ্ধ করল—গোয়েন্দা দারোগা হরিদাস মৈত্রের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। পুলিশের দল এধারে ছুটে আসার আগেই ফেরারীরা উধাও হ'ল। কোন

সন্ধান পাওয়া গেলনা তাদের সরকার হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু নিহত গোয়েন্দা হরিদাসবাবুর স্ত্রী লাট সাহেবের কাছে পত্র লিখে জানালেন—"আমার স্বামীকে যখন আমি আর কোন-ক্রমেই ফিরে পাবনা তখন আমি চাইনা অন্য কারো মা, বোন, স্ত্রীর আমার মতই সর্বনাশ হোক্'--

যেদিন খবরের কাগজে এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশিত হল সেদিন ষ্টার গর্বে বুক ফুলিয়ে কাননবাবুকে বললেন--"শুনুন। আমি কি দেখতে পাচ্ছি জানেন? আমি স্পষ্টই দেখছি আমাদের হয়তো জীবন যাবে কিন্তু ভারতের মুক্তি কেউ রুখতে পারবে না যে দেশের নারীর অন্তরে এতখানি মহত্ত্ব আপন মহিমায় জল্ জ্বল্ করছে সে দেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না।"

কেন্দ্রের নির্দেশমত ষ্টার চলে গেলেন কলকাতায়। সমিতির দুর্দিনে সৈনিক হ'ল রাজনীতিক। জঙ্গীবিভাগের নায়ক, দলের ভাগ্য বিধায়ক রূপে মনোনীত হলেন সমবেত অভিপ্রায়ে। বিহার থেকে স্কলারও এসেছে কলকাতায়। আশ্চর্য্যরূপে পাওয়া গেল তাকে গড়ের মাঠে বসন্তের গুটীতে সারা গা ছেয়ে গেছে। বেদম জ্বর,--সংজ্ঞাহীন। একজন পুরাতন বিপ্লবী কুড়িয়ে পেলেন তাকে মনুমেণ্টের পাশে। সম্বলহীন ফেরীবীদের দরদভরা সেবায়, শুশ্রূষায় স্কলার সুস্থ হয়ে উঠল। ঠিক হল পূর্ববঙ্গের ভার নিয়ে সে যাবে ঢাকায়।

* * *

ঢাকা শহরের ফলতাবাজার মহল্লার সিঙ্গার কোম্পানীর এজেণ্ট—শ্রীহরিচৈতন্য দে'র বাসা। স্কলার আর ষ্টার সেখানে এসে হাজির হ'ল। আসার পথে ষ্টীমারের ওপরে তাদের যেন মনে হ'ল একটী লোক বারবার ঘোরাফেরা করছে তাদের আশে পাশে। দূর হতে লক্ষ্যও

করছে মাঝে মাঝে। স্কলার চুপি চুপি ষ্টারকে বল্‌লে—"নিশ্চয সি, আই, ডি। আমাকে তো এখানে কেউ চেনেনা। বোধহয আপনাকে চিনতে পেরেছে।"

ষ্টারের মনেও সন্দেহ হযেছিল। তবু তিনি হাসিমুখেই বল্লেন—"নাভি পর্য্যন্ত দাড়ি রেখেছি। এত ফাইন করে তা ব্রাস করেছি। কোঁচানো চাদর গলায জড়ানো—কোঁচাটাও দিযেছি তোফা কুঁচিয়ে,—একেবারে ষোল আনা ব্রাহ্ম মন্দিরের প্রধান আচার্য—আমাকে সন্দেহ করে সাধ্য কার। তবু যখন তোমার সন্দেহ হয়েইছে—তখন কিছুটা অভিনয করতেই হবে। খুব গম্ভীর কর মুখখানা—একেবারে বিষাদে বিবর্ণ। লোকটী পাশে পাশে এলেই চালাবে দীর্ঘশ্বাস—আর চোখে রুমাল।"

তাই হল। লোকটী কাছে আসতেই স্কলার চোখে রুমাল দিয়ে—ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে লাগল। ষ্টার তার গাযে হাত বুলাতে লাগলেন। আর বুঝাতে লাগলেন—"তর কি অইছে ক' তো? এত কান্দস্ ক্যা? মাযের অসুখ,—খবর পাইছস। হের লাইগ্যা কাইন্দা অইব কি? আগে বাড়ী গিযা ছাখ মা তর ক্যামন আছে। কাঁদন তো মাইয়া মানুষের কাম। জোয়ান ব্যাটার কাঁদন কিরে?—চ—অ—অ-"

ক্রন্দনাভিনয শেষ হতে না হতেই নারাযণগঞ্জ পৌঁছে গেল। ষ্টীমারের বাঁশী দুইবার বেজে উঠল, জাহাজখানি অর্দ্ধবৃত্তে ঘুরে ফ্ল্যাটে ভিড়ার জন্য ধীরে ধীরে এগুতে লাগল।—হড় হড় করে মোটা দড়ি ছাড়া হচ্ছে,—ফ্ল্যাটের খালাসীরা দড়ি ধরে নিয়ে বেঁধে দিল তীরে গাড়া খুঁটোর সাথে,—ফ্ল্যাটের সাথে। এইবার সিঁড়ি নামান হ'ল। হুড়াহুড়ি করে যাত্রীরা নামতে সুরু করেছে,—ওপরে—অপেক্ষ্যমান রেলগাড়ীতে সুবিধামত স্থান করে নেবার জন্যে। ষ্টার লক্ষ্য করলেন সেই লোকটী ভিড়ের মধ্যে আগেভাগেই নেমে পড়েছে তীরে—সেখান থেকেই একদৃষ্টে

লক্ষ্য করছে তাদের গতিবিধি। ষ্টারের আর সন্দেহ রইলো না যে সে সি, আই, ডি। স্কলারকে তিনি বললেন—"প্রস্তুত থেকো—হয়তো জীবনের চরম দিন আসন্ন। কিন্তু সর্বোচ্চ মূল্যে বিকোতে হবে জীবন।" উভয়েই ধীরে ধীরে নেমে এল ষ্টীমার থেকে। ষ্টারের ডান হাতে টিকেট আর বাঁহাতে 'দিল্লী দরবারের" একখানা ছবি। তাঁর কিছুটা পিছেই স্কলার। উভয়েই আড়চোখে চেয়ে দেখছে লোকটীকে। সে যেন তাদেরই প্রতীক্ষা করছে। চেকারকে টিকেট দিয়ে উভয়েই প্রস্তুত হ'ল চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু লোকটীর কাছাকাছি এসেই ষ্টার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লোকটীর বাঁহাতের তর্জনীতে ঝুলানো রয়েছে একটি মোমবাতির ষ্ট্যাণ্ড।—এযে পূর্ব নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন,—আগন্তুকের হাতে থাকবে "দিল্লী দরবার" আর অভ্যর্থনাকারীর হাতে থাকবে মোমবাতির ষ্ট্যাণ্ড। লোকটি ষ্টারের পাশে এগিয়ে এসে বলল—"আসুন,"—

নিঃশব্দে উভয়েই তাকে অনুসরণ করল। বাসায় পৌঁছে ষ্টার তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন।—জিজ্ঞেস করলেন—"কয়েন তো ষ্টীমারের উপরে আমাগো আশে পাশে ঘোরাফেরা ক্যান কোরত্যাছিলেন,—আর দূর থনে দেখত্যাছিলেন চাইয়া চাইয়া? হাতেঁ ষ্ট্যাণ্ডটা না থাখলে দিতাম্ বসাইয়া।"

ষ্টারের বাহুপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে বন্ধু বললেন—"আমার ওপর ভার ছিল আপনাদের নিয়ে আসার। কাল আমায় যেতে হয়েছিল ফরিদপুরে একটি কাজে। আজ টেপাখোলায় চেপেছিলাম একই জাহাজে। আপনাদের দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—আপনিই ষ্টার। আবদুল্লাপুরে আমিও ছিলাম কিনা। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না। যে লম্বা দাড়ি আর আচার্য বেশ! কিন্তু সবচেয়ে ফাইন হয়েছে আপনাদের কাঁদা আর সান্ত্বনার অভিনয়। আমি তো প্রায় ভড়কেই গিয়েছিলাম—মনে হচ্ছিল যেন ভুল করেছি।"

এইবাব স্কলাব চাপা গলায় কান্না জুড়ে দিল—"ওবে—মাবে ! আমাগো ফেইল্যা কৈ গেলিবে !"—সকলেই একযোগে হেসে উঠল।

একদল তরুণের মনেব ওপব পাহাড় প্রমাণ বোঝা। দেশমুক্তির গুরুদায়িত্বের গম্ভীব পবিবেশে হাল্কা আনন্দেব অবসব পায়না এরা। কোটী কোটী দেশবাসীব মুখে হাসি ফোটানোব দায়িত্ব নিযে নিজেদেব হাসি এবা স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে—অশেষ লাঞ্ছনাব হাত থেকে দেশকে মুক্ত কবাব পণ নিযে এবা সর্বপ্রকাবে বঞ্চনা কবেছে নিজেদেবকেই। দেশাত্মাব প্রতিষ্ঠায এবা কবেছে আত্মদান,—বিদেশী স্বার্থের দস্যুতা থেকে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে এবা সেজেছে দস্যু, দেশপ্রেমেব অদম্য প্রেবণায অপবাদ ও অপমানেব পশবা স্বেচ্ছায ববণ কবেছে এই তরুণদল, শুধু বিদেশীবা নয—এদেব দেশবাসীরাও উচ্চকণ্ঠে প্রচার কবে—এবা দস্যু, এবা তস্কর—এবা দর্নীতিপবায়ণ—এবা হত্যাকারী। এই দুর্লঙ্ঘ্য দৈহিক ও মানসিক বাধা আগ্রাহ্য কবেই চলেছে এবা। তাই দেহ মনের এই নিয়ত সংগ্রামমুখী পবিবেশেব মধ্যে, একটু চপল হাওয়া, একটু হাল্কা আনন্দেব অবকাশ বড়ই উপভোগ করে এবা মনে প্রাণে।

কিন্তু তা' নিতান্তই ক্ষণিক। মুহূর্তেই দৃশ্য পালটে যায়—কমিক সিনের পবই এসে পড়ে যুদ্ধের মন্ত্রণা সভাব গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীর পরিবেশ। রাত্রিব হাল্কা হাওয়াব পবে প্রভাত থেকেই দেখা দিল কর্তব্যেব গুমোট গবম। ষ্টার ধীবে ধীবে স্কলাবকে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী সংস্থা বুঝিযে দিচ্ছেন। পরিচয কবে দিলেন ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, বরিশাল, প্রভৃতি জেলার বিপ্লবী সংস্থার নাযকদের সাথে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম সব জেলার সংগঠকরাই ক্রমে ক্রমে পরিচিত হল স্কলারের সঙ্গে।

একদিন জেলা সংগঠকদেব নিযে ষ্টারের জরুবী মন্ত্রণাসভা বসে গেল। ষ্টার বললেন—"আমাদের সংস্থা যেমন দুর্বল হযে পড়েছে তা'তে

আব সর্বভারতীয বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশা কবা যায না। এখন আমার মনে হয় আমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে পূর্ব্ববঙ্গেব বিদ্রোহ ঘোষণা আবশ্যক। জানি আমাদেব উপব সাম্রাজ্যেব শক্তি নিয়ে বৃটিশ পডবে ঝাঁপিয়ে,—আমাদেব অভ্যুত্থান অচিবেই দমিত হবে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব,—কিন্তু আমাদের এই বীবেব মৃত্যু দেশকে দিয়ে যাবে নবজীবন।"

স্কলাব বললে—"দেশেব মুক্তিব জন্যে মবতে আমাব অসীম সাধ। কিন্তু আমার মনে হয় এবকম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান নৈবাশ্যেব প্রতিধ্বনি—জীবনেব বিনিময়ে কর্মকে এড়িয়ে চলা। জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এ যেন আমবা আত্মহত্যা কবছি। একথা খুবই সত্যি যে আমাদেব সংস্থা ঢেব দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই পথে যদি আমাদের অচল নিষ্ঠা থাকে তা'হলে আমরা সংখ্যায কম বলে কিছুই আসে যায় না। আবাব আমবা সবল হব, প্রবল হব,—প্রতিপক্ষকে আঘাত দেবাব শক্তি সংগ্রহ কববই।"

স্কলাবেব প্রচণ্ড বিশ্বাস সংক্রামিত হ'ল প্রত্যেকেব মনে। ঠিক হ'ল চালিয়ে যেতে হবে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি, বিস্তৃত কবতে হবে সংস্থাকে।—আদর্শই বড কথা—আদর্শ অজব, অমব। নূতন প্রেরণা নিয়ে সকলে ফিবে গেল নিজ নিজ জেলায়,—বণক্লান্ত হলোনা বিদ্রোহী,—দেখা দিল সে আদর্শেব জীবন্ত মূর্তিরূপে,—মানুষেব সত্তা ডুবে গেল বৈপ্লবিক আদর্শেব সত্তায।

ষ্টাব তখনও ঢাকাতেই আছেন। প্রতি বাতে আহাবেব পব বসে আলোচনা সভা। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, এসব নিয়েও হয় কত আলোচনা। স্কলাবের দৃঢ আত্মবিশ্বাস। ওব সমস্ত অন্তর যেন গীতাব ভাবে অনুপ্রাণিত। সে প্রায়ই শান্ত অথচ দৃঢকণ্ঠে বলে—"আমি বিশ্বাস কবি সমর্পিত প্রাণ সাধকের কাছে সুখ দুঃখ, জীবণ মবণ সবই সমান। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহন্তি পাবকাঃ"—এ শুধু কথার কথা নয়। আত্মা অজর অমর—এ বিশ্বাস যাব আছে, মবণেব কোন ভয তার নাই,

—মৃত্যু তাকে কোন ক্লেশই দিতে পারে না।"

ষ্টাব বললেন—"ও সব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমি বুঝিনে। আমি বুঝি জীবন—জীবন আর মৃত্যু—সে শুধু মৃত্যুই। আমি এইটুকুই বুঝেছি দেশেব মুক্তিব জন্যে আমাদেব আত্মত্যাগ কবতে হবে, জীবন দিতে হবে। খুন আব ডাকাতিকে আমি কোন আধ্যাত্মিক ছাপে বাঙ্গিযে তুলতেও চাইনে। আমি জানি দেশমুক্তিব জন্যে ওটা প্রবোজন হয়েছে। তাই মনে বাধলেও কবতেই হবে আমাদেব স্বামীজীব কথা—"দেশেব জন্য আমি হাজাব জনম নেব, লাখো নবকে যাব", আমাব বডই ভাল লাগে। আমি পূব বঙ্গেব অভ্যুত্থানেব কথা বলেছি এইজন্যে—দেশ হয়ে পডেছে জডভবত। বেঁচে থাকার পবম আগ্রহে সে তিলে তিলে কুকুব বেডালেব মত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মবাদেশকে শেখাব মবণেব পথেই আসবে নবজীবন"--

স্কলাব শ্রদ্ধাভবে ষ্টাবেব কথাগুলি শুনল। তাবপব বলল--"আপনার প্রত্যেকটি কথা মানি আমি। মানি। আমাদেব মৃত্যুই করবে আমাদের আদর্শ প্রচাব। কিন্তু মবণই সবচেয়ে বড কথা নয়—অচঞ্চল নিষ্ঠা নিযে আমাদেব এগুতে হবে বিপ্লবেব পথে। তাতে যদি আসে দুঃখ আসে মরণ কোন ক্ষোভ নেই পার্টিব এই দুর্দিনে আমাব মনে সর্বদাই ভেসে ওঠে ম্যাটসিনিব অভয়বানী Despair not young exiles. "Elevate your pilgrimage to the height of a religious mission, you must succeed. You may die—but your dea will never die." সত্যিই কথাগুলো আমাব মনে আনে অপূর্ব ভবসা,—আমি যেন উপলব্ধি কবি ভাব অমরবীর্য, জীবন অজব অমব।"

এইবকম কত আলোচনা হয় তাদেব। মাঝে মাঝে দুই, তিন, চাবজনও যোগ দেয় আলোচনাতে। ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন। সন্ধ্যাব পব স্কলাব বের হয়ে গেল বাসা থেকে। ঢাকা সংস্থার কয়েকটি কর্মীব সাথে দেখা কবে সে

আব ঢাকাব সংগঠক ফিবেছে বাসাব দিকে। স্কলাবেব মনে হল কেউ যেন তাদেব অনুসরণ করছে। মনের কোণেব সন্দেহ যাচাই করে নেবার জন্যে কয়েকটা আঁকা বাঁকা গলি পার হযে গেল তারা। অবশেষে চারদিক চেয়ে বিশেষ সতর্কভাবে বাসায় ঢুকলো। মন খুলে হেসে নিল তারা। স্কলার বললে—"সদা সতর্কভাব রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছে আমাদের। কেউ একটু ভাল কবে আমাদের দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাং করে উঠে। আমাদের প্রাণেব মাযা কত ছাযা সৃষ্টি কবেছে।"

রাত্রে খেযেদেয়ে আবার চলেছে আলোচনা। স্কলাবেব মুখে গীতাব কথা—জীবন অজর-অমর। অনেক রাত কথাবার্তাব পর সে পড়েছে ঘুমিয়ে। শেষ রাতে উঠে সে চলে গেল পাযখানায। হঠাৎ সে চমকে উঠল ষ্টারের চীৎকারে—"হুঁসিযার—পিস্তল।'

সাথে সাথেই সংগ্রাম সুরু হযে গেছে। ষ্টারের মশার পিস্তল অবিরাম গর্জে উঠছে—"গুড়ুম-গুড়ুম"। ওধাব থেকে পুলিশ করছে রাইফেল থেকে অগ্নিবৃষ্টি। পুলিশের একজন জমাদাব নিহত হযেছে—গোযেন্দা ইন্সপেক্টর বসন্ত মুখার্জি ও প্রফুল্ল বিশ্বাস গুরুতব আহত। স্কলাব দৌড়ে এসে দাঁড়িযেছে ষ্টাবের পাশে। ষ্টাবের সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত—আট দশটা গুলী বিঁধছে তাব গায়ে,—অবশেষে "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণের সাথে সাথেই তাঁব প্রাণহীন দেহ লুটিযে পড়ল ভূমিতে। স্কলার একবাব চেযে দেখল তাব দিকে। এইসময একটা গুলী এসে তার বাম বাহুমূলে বিদ্ধ হল। ভ্রূক্ষেপই যেন নাই তার। সে সমানেই চালাচ্ছে মশাব পিস্তল।—তার মনে যেন অমিতবীর্য,—মাথাটা যেন ছাড়িযে উঠছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মন তাব যেন বলছে—"তুমি আত্মা,—তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—রোগ নাই, জরা নাই, তোমার কামনার কিছুই নাই—তুমি অজর অমর, নিস্পৃহ।" চারদিকে গুলী চলেছে অবিরাম—হরিচৈতন্য মাটীতে পড়ে গেল, মুখ দিযে বের হ'ল গোঙ্গানির কাতরতা। স্কলার

শুধু চেয়েই দেখল,—কোন কিছুতেই যেন তার প্রাণের সংযোগ নেই,—সে যেন এ জগতের মানুষই না।

হঠাৎ আরও দুটো গুলী এসে তার বক্ষ ভেদ করল আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না—পড়ে গেল।

খানিকবাদে হরিচৈতন্য আর স্কলারকে নিয়ে মিটফোর্ড যাওয়া হল হাঁসপাতালে। শুশ্রূষায় স্কলারের সংজ্ঞা ফিরে এল। চেয়ে দেখল সে হরিচৈতন্যের দিকে—তার মাথার ব্যাণ্ডেজের দিকে। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে,—না?"

তারপর চেয়ে দেখল পুলিশ বেষ্টনীর দিকে—সাশ্রুনয়ন জনতার দিকে। কেউ বলছে—হায়। হায়! স্কলারের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। স্মিত হাস্যে সে জিজ্ঞাসা করলে—"এদের মনেও কষ্ট হয়? আমাদের এই অবস্থা দেখে এরা হায় হায় করছে! তবে আর ক্ষোভ নেই এ দেশ জাগবে—মুক্ত হবে—এই বিশ্বাস নিয়ে যেতে পারব।"

সি, আই, ডির দল ঘিরে ধরেছে স্কলারকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—নাম কি—কোথায় বাড়ী? মৃত্যু পথযাত্রী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল "Dont disturb—please let me die peacefully" তারপর হরিচৈতন্যবাবুর দিকে চেয়ে বললে সে—হরিবাবু,—ভাব অমরবীর্য,—আত্মা অজর-অমর। ইংরাজের সাধ্য নাই ভাবকে বিনাশ করে, আমাকে মেরে ফেলে। "দেহীনাঞ্চ যথা দেহে কৌমারং, যৌবনং জরা,—মৃত্যু দেহের বদল—জীর্ণানি বস্ত্রানি যথা বিহায়, গৃহ্ণাতি নবানি নরোপরাণি'

আর সে বলতে পারলনা। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠল—অপলক হয়ে গেল তার দৃষ্টি, দেহটা শুধু একবার কেঁপে উঠল, তারপর সব স্থির। একটি শব্দ নাই, একটুও কাতরতার চিহ্ন নাই মুখমণ্ডলে, প্রগাঢ় শান্তি মুখখানি ঘিরে। অজর অমর আত্মা মরদেহ ত্যাগ করেছে। হরিচৈতন্য আছড়ে প'ল তার বুকে, চেঁচিয়ে উঠল—"স্কলার—ভাই

তোমার তো মৃত্যু নাই—তুমি যে অজর-অমর”—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল বালকের মত।

সি, আই, ডি কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েছে' এই বীরযুগল কে—কি পরিচয় তাঁদের—সন্ধান পায়নি তারা। বুড়ি বালামের তীর থেকে ফিরে এসে যতীন-চিত্ত কি দেখা দিয়েছে নবরূপে? ষ্টার ও স্কলারের ফটো তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল দিকে দিকে। যারা নিজেদের পরিচয় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ব্যক্ত করেনি, গুপ্ত সমিতির গোপনীয়তা রক্ষা করেছে প্রাণ দিয়ে—বিশ্বাসঘাতকের মুখে মিলল তাদের পরিচয়। ষ্টার হলেন ত্রিপুরার তারিণী মজুমদার—আর স্কলার মুর্শিদাবাদের নলিনী বাগ্চী।

বিচারে হরিচৈতন্যের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু তার বুক ভেঙ্গে গেল না এই দারুণ আঘাতে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ষ্টারের রক্তাপ্লুত দেহ, স্কলারের প্রশান্ত মুখখানি।—আর মাঝে মাঝেই শুনতে পায় স্কলারের কণ্ঠস্বর—ভাব অমর বীর্য,—আত্মা অজর-অমর

সংঘাত

ভীষণ পথের যাত্রীদলে পরস্পরের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে এমন আন্তরিকতা যা'র তুলনা কোথাও মেলেনা। কোনদিন দেখিনি, শুনিওনি তার কথা, জানিওনা কি নাম, কি জাত, কোথায় বাস—কিন্তু সে আমার দলের লোক, একই দুর্গম তীর্থের সহযাত্রী—শুধু এই পরিচয়—মুহূর্তেই তাকে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ করে দেয়। এর মধ্যেও আবার ইতর বিশেষ আছে। দলের সকলেই প্রিয়,—কিন্তু কোন বিশেষ

একজন অপর একজনের প্রিয়তম হয়ে ওঠে। কাশীর সুশীল লাহিড়ী আর বিনায়ক কাপ্‌লের মধ্যে এই প্রকারের ঘনিষ্ঠতাই জন্মেছিল। দলের মন্ত্রগুপ্তি অটল রেখেও সুযোগ পেলেই উভয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত- গল্পে, আলোচনায় মশগুল হয়ে কাটিয়ে দিত। কত আলোচনা কোরত এই দু'টী তরুণ! কেমন করে দেশ স্বাধীন হবে,—স্বাধীন হলে দেশে কি শাসনের প্রতিষ্ঠা হবে; রাজতন্ত্র-না—গণতন্ত্র? প্রায়ই কোন মীমাংসায় পৌছত না তারা। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন কেটে যেত তর্কে। সুশীল আদর্শবাদী। সে বলত "গণতন্ত্রই আমাদের আদর্শ। হোকনা রাজা রামচন্দ্র,—আমরা চাইনি রাম-রাজত্ব। একজনের সার্বভৌম অখণ্ড ক্ষমতা থেকে আজ হয়তো সুখ শান্তি পেতে পারি। কিন্তু কাল তা' থেকে দুঃখ ও শাস্তিও পেতে পারি—তারপর দেশের প্রত্যেকটী লোক অনুভব করবে যে দেশের শাসনকার্যে তারও যোগাযোগ আছে তবেই তো হবে সত্যিকারের স্বাধীনতা।"

বিনায়ক হেসে বললে—"প্রত্যেকের সত্যিকারের স্বাধীনতা একটা নিছক ভাঁওতা, গণতন্ত্র একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি। পৃথিবীর কোথায় চলেছে গণতন্ত্র? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড—কোথাও? আসলে হচ্ছে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র এখনও চলেছে ভোল্ বদলে গণতন্ত্রের মুখোস নিয়ে। মানুষ মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে দাপটের জোরে —যেমন আগেও রাখত। সত্যি কথা হচ্ছে—আদিম বর্বর মানুষটা একটুকুও বদলায়নি,—বদলেছে তার পোষাক পরিচ্ছদ, বদলেছে তার বঞ্চনার প্রথা। আগে মানুষে মানুষ খেত। এখনও তাই খাচ্ছে তবে বেশ রসিয়ে রসিয়ে,—বড় বড় বুলির আবরণে। একেই বলিস্ গণতন্ত্র?—ছোঃ!

"অর্থাৎ অন্য মানুষে মানুষ খাচ্ছে বলে আমাদেরও খেতে হবে মানুষ। সত্যিকারের স্বাধীনতা আসেনি বলে মেনে নিতে হবে অধীনতা, গণতন্ত্র

হয়নি বলে বরণ করতে হবে রাজতন্ত্র? অতি উত্তম যুক্তি তোমার”—সুশীল উত্তর দেয়।

তর্ক করতে করতে দুজনে উপস্থিত হল শচীনদা'র (শচীন সান্যাল) কাছে। কাশীর বিপ্লবী দলের তিনিই নায়ক। সুতরাং এসব তর্কের মীমাংসাও তিনিই করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য তিনি ধীরভাবে শুনলেন। হেসে বললেন—“কি বিষয়ের মীমাংসা করে দিতে হবে ভেবে পাচ্ছিনে। তোমাদের বিরোধ কোথায়? কি নিয়ে এত তর্ক করছ তোমরা? বিনায়ক বলছে, ‘মানুষের প্রবৃত্তি আদিম যুগের মত বর্বরই রয়ে গেছে—সত্যিকারের গণতন্ত্র কোথাও নাই।’ এই তো? আমি মনে করি সুশীলও এটা স্বীকার করে। তারপর সুশীল বলেছে—‘আমরা চাই সত্যিকারের স্বাধীনতা—যাতে দেশের প্রত্যেকটী লোক অনুভব করতে পারে দেশ শাসনে আমারও অংশ আছে’ এতে আর কার বিরোধ থাকতে পারে? বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এটা সম্ভব হয়নি। আর বিদেশীর শাসনের তলে সে সমাজ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের আদর্শ হচ্ছে সেই সমাজ সৃষ্টি করা যাতে সমস্ত মানুষ হবে সমান, রাষ্ট্র হবে সকলের। আর তার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হচ্ছে বিদেশীর শাসন হতে মুক্তি অর্জন। তোমরা উভয়ে একই কথা বলেছ খণ্ড খণ্ড ভাবে, দুজনকে একত্রে নিয়ে একই আদর্শ গোটা রূপ নিয়েছে—অর্থাৎ দুই বন্ধু একে অন্যের পরিপূরক।”

দুইবন্ধু ডগমগ খুশী হয়ে শচীনদা'র কাছ থেকে বিদায় নিল। পথে বিনায়ক বললে—“বুঝলি তো দাদা কি বললেন? তুই, আমি কেউ সম্পূর্ণ নই—দুজনে মিলে গোটা মানুষ। অর্থাৎ আমাকে ছাড়া তুই আধা মানুষ—আর তোকে ছাড়া আমিও তাই।”

কিন্তু তাদের এই জমাট বন্ধুতার নীড় ভেঙ্গে গেল কাশী ষড়যন্ত্র মামলায়। অকস্মাৎ শচীনদা প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ধৃত হয়ে

গেলেন জেলে। বিনায়ক, নরেন ব্যানার্জি ও প্রিয়নাথ দলের আদেশে পালিয়ে এল বাংলা দেশে,—সুশীল ছিটকে গেল কাংড়ি গুরুকুল বিদ্যালয়ে। এরপর অনেকদিন দেখা হয়নি দুই বন্ধুতে।

১৯১৭ সালের মার্চ মাস। যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীসংস্থার নায়ক এখন সুশীল লাহিড়ী। কেন্দ্রের ডাকে সে চলে এল চন্দননগরে। রেল ষ্টেশনে যে ব্যক্তি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল তাকে দেখেই সুশীলের মুখে হাসি দেখা দিল। সে হল তার অতি পরিচিত নরেন ব্যানার্জি। ষ্টেশন হাতার বাহিরে এসে সুশীল জড়িয়ে ধরল নরেনকে। নরেন বলে —"এই ছাড়্ ছাড়্। এটা বাংলা দেশ—স্পাই আর সি, আই, ডি-তে ভরা। এ কেয়া তেরা বোটী কা দেশ? ছোড়ো ভাইয়া! ছোড় দো মুঝে।"

"ম্যয় কভি না ছোঁড়ুঙ্গা তুঝে, এ বাঙ্গালী মছলী খানেবালে"—হেসে জবাব দেয় সুশীল।

দুজনের মনেই অজস্র প্রশ্নের তরঙ্গ দোলা দিয়ে যায়। কিন্তু কেউ বলতে পারেনা মুখ ফুটে। গুপ্ত সমিতির গোপনতা অসাড় করে দিয়েছে এদের জিহ্বা,—পণ-রক্ষায় স্বেচ্ছায় এরা বোবা সেজেছে। কাশী কেন্দ্রের কত সহকর্মীর কথা মনে হয় নরেনের। তারা কে কেমন আছে, কাজে কতখানি যোগ্যতা দেখিয়েছে, এরমাঝে কেউ ধরা পড়েছে কিনা সবটা জানার জলন্ত আগ্রহ তার মনে। সুশীলের যাদুস্পর্শ নরেনের মনের পরদায় অকস্মাৎ অজস্রধারে আলোকসম্পাত করল। আর তাতে সিনেমার ছায়াছবির মত সমগ্র বেনারস,—নরেনের জন্ম ও কর্মভূমি তার অফুরন্ত পরিচয় নিয়ে ভেসে উঠল। বেনারসের পথঘাট, প্রান্তর, কান্তার, অলিগলি, অট্টালিকা, মন্দির, সবই দৃশ্যের পর দৃশ্যের মত ভেসে উঠল তার মনে। বৈপ্লবিক কর্মজীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায়,—তার বহু পরিচয়, প্রেরণা, আনন্দ ও বেদনা নিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য ক্ষিপ্রবেগে অতিক্রান্ত হতে লাগল

মনের পরদায়। সীমাবদ্ধ, অর্গলরুদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে এই নির্বাক ছবির অন্তর্যামী ছাড়া দ্বিতীয় দর্শক ছিলনা।

সুশীলের চিন্তার পরিধি কিন্তু তিনজনে সীমাবদ্ধ। তারমধ্যে একজন সামনেই। অপর দুইজনের মধ্যে বিনায়কের মূর্তিই অফুরন্ত সজীবতা নিয়ে আলোড়িত করেছে তার মনকে।

"বিনুর খবর কিরে?"—জিজ্ঞাসা করে সুশীল।

চোখে মুখে অতিমাত্র বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে নরেন বলে "বিনু? সো কোন হ্যয়? ম্যয়তো উস্‌কো নেহি পয়ছান্তা।"

"বা-রে! তুই বিনুর কথা ভুলে গেলি! বিনু,—বিনু,—আমাদের কাশীর বিনায়ক—বিনায়কবাও কাপলে।" সুশীল বুঝিয়ে বলে।

আরও গম্ভীর হয়ে নরেন উত্তর দেয়—"আরে কেয়া বোলতা হ্যয় ইয়ে রোটীওয়ালে। ছাতুখোরকা ঢংই দুস্‌রা হ্যয়। ইয়ে বাংলা মুলুক' হিঁয়া কাঁহাসে আওয়েগা মারাঠী বিনায়ক কাপলে। হিঁয়া সত্যেন কো বাৎ বোলো—উস্‌সে মোলাকাত মাঙ্গো—উও আলবত্তে ম্যয় কর্ সক্তা। আচ্ছা করকে সমজ লিজিয়ে "ইয়ে বানারস নেহি হ্যয়—বাবুসাহেব,—ইয়ে হ্যয় বাংলা।"

"সত্যেন আবার কে?" সুশীল প্রশ্ন করে।

"নেহি জান্তা? আরে উও তো বহোৎ ভারী আদমী—বাংগাল কা ইন্‌চারজ। তুমহারা তো উসীকে সাথ' পাহেলে ভেট করনে হোগা; উও তুমহে লে জায়েঙ্গে রাজন বাবুকা পাশ।" বুঝিয়ে বলে নরেন।

"ঢের হয়েছে বাঁদুর! এখন হেঁয়ালী রাখ। বিনু এখানে আছে কিনা বল।" সুশীল বলে।

"এখানে বিনু টিনু নাই। আগে সত্যেন বাবুর সাথে দেখা কর,—তিনিই তোকে সব বুঝিয়ে দেবেন।" নরেনের ঐ একই কথা,—হিন্দীর বদলে বাংলা সংস্করণ।

অলিগলি পার হয়ে নরেন ও সুশীল প্রবেশ করল একটি বাসার দোতালায়। সামনের ঘেরা বারান্দায় দুইটী বালক বসে স্টোভে ভাত বাঁধছে,—একজন নিবিষ্ট চিত্তে ছুরির সাহায্যে আলুর তরকারী কুটছে। আগন্তুক দুজনের দিকে সকলেই একবার চেয়ে দেখল। শুধু এই মাত্র। তারপর যে যা'র মত কাজ করে যেতে লাগল। কে এল, কে গেল কারও ভ্রূক্ষেপই নাই যেন সে বিষয়ে। সুশীলকে নিয়ে নরেন প্রবেশ করল এক কামরায়। তারপর সে গেল অন্য ঘরে। একটু পরেই সে সুশীলের কাছে এসে বলল-"সত্যেনবাবু এসেছেন। এবারে চল তাঁর সাথে দেখা করিয়ে দি।"

বাংলাদেশের নায়কের সাথে দেখা! হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হবে। সুশীল স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির। সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। মনে মনে সে ঠিক করে নিল সোজাসুজি প্রশ্ন করবে সত্যেনবাবুকে,—"আর ছেলে রিক্রুট করে কি হবে? এখন সর্বশক্তি প্রয়োগে সেনাদলে বিদ্রোহ প্রচার উচিত নয় কি? কয়েকটা পিস্তল আর বিভলভারে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা গেলেও তার দ্বারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্ভব নয়।"

নরেনের পিছে পিছে সে প্রবেশ করল একটি ঘরে। ঘরখানি বেশী বড় নয়। এক কোণে মেঝের উপরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। তার কম্পিত শিখা যেন আঁধারের রাজ্যে আলোড়ন এনেছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে সুশীল দেখল একটি লোক বসে আছে একখানি কম্বলের উপরে। নরেন পরিচয় করে দিল "এই সত্যেনবাবু। এইবার আলাপ করুন আপনারা।" সে ফিরে দোর পর্যন্ত অগ্রসর হল। সুশীল ও সত্যেন মুখোমুখি বসে। সত্যেন জিজ্ঞাসা করল "ইউ, পি'র খবর কি?"

সত্যেনের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সুশীল। ঠিক এই মুহূর্তেই নরেন মোমবাতিটী উঠিয়ে এনে স্থাপিত করল উভয়ের মাঝে। হঠাৎ সুশীল

জড়িয়ে ধরল সত্যেনকে—অস্ফুট স্বরে বলেই চলল "বিনু—বিনু তুই ? তুই এখানে ?"

সত্যেন ধীরে ধীরে জবাব দেয় "আরে বিনু না—বিনু না—আমি সত্যেন।"

নরেন এইবার সুশীলের বাহুর বেষ্টনী থেকে সত্যেনকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সুশীলের হাত ধরে টানাটানি সুরু করে দিল! আর বলতে লাগল—"আরে ভেইয়া। এ কেয়া হ্যয় ? ছোড়—ছোড়। তুমহারা বিনু হিঁয়া কায়সে আওয়েগা ? সমঝো—ইয়ে তুমহারা বানারস্ নেহি হ্যয়—ইয়ে হ্যয় বাংগাল।"

দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে অভিভূত হয়ে রইল তারা বহুক্ষণ। দুজনে যে দুইটী প্রদেশের বিপ্লবী সংস্থার নায়ক এই কথাটা একদম ভুলে গেল তারা। সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ঘৃণা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি ভাব দিয়ে গড়া যে মানুষের মন সে মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে বৈপ্লবিক আদর্শের সত্ত্বায়। মানুষকে জেনেশুনে তারই উপাদানে গড়া হয়েছে আদর্শের অনুপম মূর্তি। কিন্তু ক্ষণপরে যেন এই দেবমূর্তি অতল তলে ডুবে গেল,—আর তার স্থলে আবির্ভূত হল মানুষ তার প্রেম, মিলন, আনন্দ ও অশ্রুর অনুভূতি নিয়ে।

এইবার ডাক পড়ল তাদের রাজেনবাবুর সাথে দেখা করবার। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলল। ভোরে সত্যেনের নিকট বিদায় নিয়ে সুশীল রওনা হল এলাহাবাদে।

সত্যেনের সজীবতা বাংলার বিপ্লবী সংস্থায় এনে দিয়েছে উৎসাহ। গ্রেপ্তার আর অন্তরীণে যে দল পড়েছিল নেতিয়ে—সত্যেনের উৎসাহে, কুশলতায় তা'তে আবার জোয়ার এসেছে। সত্যেন দলের সম্পদ। তার উপর বাংলার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নরেন, কালু, ফিলসফার, ছোট ফিলো প্রভৃতিকে সাথে নিয়ে রাজেনবাবু গেলেন গৌহাটীতে।

পালোয়ান বাংলায় সত্যেনের উপদেষ্টা হিসাবে রয়ে গেলেন। পালোয়ান পুরাতন বিশ্বাসী কর্মী। তিনিই বাংলা ও গৌহাটী কেন্দ্রের মাঝে সংযোগ রক্ষা করতে লাগলেন।

দিন যায়। পালোয়ান এবং আরও অনেকের কাছে সত্যেন সম্বন্ধে অনেক গুজব পৌঁছুল রাজেনবাবুর কাণে। সত্যেনের আচরণ ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সে পালোয়ান, আরও অনেকের কাছ থেকে ব্যবধান রক্ষা করে চলে রাতে প্রায়ই থাকে না বাসায়। জিজ্ঞাসা করলেই বলে—"এ বাসা সেফ নয়। একটা খুব সেফ সেণ্টার পাওয়া গেছে। সেখানে রাতে থাকা নিরাপদ " পালোয়ানের কাছে সত্যেন সম্বন্ধে এই সব কথা শুনে অশেষ চিন্তিত হলেন রাজেনবাবু। তিনি আদেশ দিলেন অতি সতর্কতার সাথে তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে।

পালোয়ান ফিরে এলেন বাংলায়। সত্যেন যেন তাঁকে এড়িয়ে চলে যুক্তি পরামর্শ সবই করে তেজেনের সাথে। কিন্তু কূটবুদ্ধি পালোয়ানের সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি ধেয়ে চলল তার পিছে পিছে। পালোয়ান, ষ্টার, মাষ্টার সকলেই সত্যেন আর তেজনের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখল তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্যেন তা' টের পেল।

১৯১৭ সালের শেষ ভাগ। একটির পর একটি বিপ্লবী ফেরারী ধরা পড়ছে। এই সময় সত্যেন আর তেজেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পালোয়ান, ষ্টার, মাষ্টার সবাই শঙ্কিত হয়ে পল। তবে কি ওরা গ্রেপ্তার হয়েছে? প্রত্যেকখানি দৈনিক কাগজ পড়ে দেখে সকলে কিন্তু কাগজের পাতায় কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তাদের। রাজেন বাবুর নির্দেশ মত খোঁজ নিয়ে জানা গেল দুই হাজার টাকা আর দুইটী রিভলভার নিয়ে উধাও হয়েছে সত্যেন আর তেজেন। এই খবর পেয়ে রাজেন বাবু প্রদেশে প্রদেশে পত্র দিলেন তাদের সন্ধানের জন্য।

১৯১৮ সালের প্রথমভাগে কেন্দ্রের সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধাব কবে সুশীল স্তম্ভিত হযে গেল। চিঠিতে লিখা ছিল "সত্যেন দলের শৃঙ্খলা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। যেখানে পাও সরিযে ফেল।"

সুশীলেব হাত দুইখানি থব্ থব কবে কাঁপতে লাগল। প্রচণ্ড আঘাতে যেন সমস্ত অন্তর জর্জ্জরিত,—অব্যক্ত বেদনায তাব সমগ্র চেতনা আর্ত্তনাদ করতে লাগল। বিনু বিশ্বাসহন্তা! এও কি সম্ভব? শুধু এই প্রশ্ন বার বার তার মনে দেখা দিল। একবাব মনে হল তার—বিনু যদি এই,—তবে আর কেন? কোন আশা নাই এ দেশেব। কিন্তু তখনও তাব ভিতবেব আদর্শময সত্তা প্রতিবাদ জানাল "তোমাব পথেব প্রেমই পথিককে প্রিয করেছে। পথই বড—পথিক নয।"

সুশীলেব নির্দেশে যুক্ত প্রদেশেব প্রতি জিলায়ই সত্যেন আব তেজেনের সন্ধান চলেছে। অবশেষে লাক্ষ্ণৌ থেকে পত্র এল "দুজন নবাগত এখানে ঘোবা ফেবা কচ্ছে,—বোধ হয় 'তাদেব' সন্ধান পাওয়া গেছে।"

সুশীল এলাহাবাদ থেকে ছুটে গেল লাক্ষ্ণৌতে। দূব থেকে দেখেই সে নিশ্চিত হল যে আগন্তুক বিনাযক। পবদিন সন্ধ্যায—সুশীলেব গুপ্তচব খবর দিল "ওবা আমিনাবাদ পার্কে।" দুইজন সহকর্মীসহ সুশীল গেল সেখানে। গিয়ে দেখে বিনায়ক গল্প করছে তেজেনেব সাথে। ত্বরিত পদে সুশীল অগ্রসব হল তাদেব সম্মুখে। বিপদেব আশঙ্কা কবে তারাও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু প্রস্তুত হবাব আগেই সুশীলেব বিভলভাব গর্জে উঠল "গুড়ুম—গুড়ুম।" গুলীবিদ্ধ হযেও একলাফে বিনায়ক জড়িয়ে ধবল সুশীলকে। চীৎকার কবে বললে সে—"একি? তুই সুশীল?" সুশীলকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। সুশীল বাধা দিল না—বিনাযকেব শিথিল বাহুব বেষ্টনী ছাড়িয়ে নেবাব চেষ্টা করল না। সহসা বিনাযকেব দেহ এলিয়ে পল—সুশীল

তাকে বুকে জড়িয়ে ধবে সেখানেই বসে পল। বন্ধুব বুকে বুক বেখেই বিনাযকেব শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হল,—সুশীলেব ঠোঁটদুটী বাব কয়েক কেঁপে উঠল, কযেক ফোঁটা অশ্রু গড়িযে পল তাব গণ্ডে। কিন্তু ততক্ষণ তেজেনেব চীৎকারে কযেকটী লোক সেখানে এসে উপস্থিত হযেছে। তাদেব হাতে হত্যাকাবী সুশীল ধৃত হল।

হত্যাপরাধে সুশীলেব বিচাব সুরু হয়েছে। সে মামলায কোন অংশ গ্রহণ কবে না। নীববেই দাঁড়িযে থাকে কাঠগড়ায। তার পক্ষ সমর্থনেব জন্য অনেকেই উকিল নিয়োগেব পবামর্শ দিয়েছেন। সুশীল শুধু ঘাড নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছে। আদালতে জজসাহেব বললেন—"তোমাব পক্ষ সমর্থনেব জন্যে, সবকার উকীল নিযোগ করেছেন। তাঁব সাথে পরামর্শ কবতে পাব তুমি।"

একটুখানি হাসিব বেখা খেলে গেল সুশীলের মুখে। সে শুধু বললে "থ্যাঙ্কস্"

চার্জ ফ্রেম হয়ে গেল ৩০২ ধাবায। জজ সাহেব প্রশ্ন কবলেন—'তোমাব কিছু বলাব আছে ?'

ঘাড নেড়ে জানাল সে—"না।"

বিচাবে সুশীলেব ফাঁসিব হুকুম হযেছে। ফাঁসির দিন প্রভাতে সুশীল বাব বাব চেয়ে দেখল নিজেব হাতেব দিকে, বুকেব দিকে। বিনায়কেব রক্ত কি মাখানো বয়েছে তাব হাতে, তাব বুকে ? বিমর্ষ হল সুশীল। কিন্তু সাথে সাথেই তাব ভেতবেব আদর্শবাদ হুঙ্কাব দিয়ে বলে উঠল—"পথই তোমাব সম্বল। পথভ্রষ্ট তোমাব কেউ না।"

ধীবে ধীবে ফাঁসিব মঞ্চে আবোহণ কবল সুশীল। সমস্ত শক্তি দিয়ে একবাব সে চেঁচিয়ে উঠল—"বন্দেমাতরম্" তাবপর ফাঁসির রজ্জুতে অবসান হল বন্ধুত্বে ও কর্তব্যে, বিপ্লবীতে ও মানুষে সংঘাত।

স্পাই

রাজসাহী কলেজ মাঠে কৃষ্ণনগর কলেজের সাথে রাজসাহী কলেজের ফুটবল ম্যাচ খুব জমে উঠেছে। হাজার কয়েক দর্শক হাটুরে হট্টগোলে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়কে উৎসাহ দিচ্ছে, শৈলেনও প্রাণপণ চীৎকার কচ্ছে—Go on, Go on,—Shoot—Goal ইত্যাদি। এমন সময় তারাদাস পেছন থেকে তার ঘাড়ে টোকা দিল। বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরাতেই তারাদাস চাপা স্বরে ভ্রূ কুঁচিয়ে বলল—"বেরিয়ে আয়।" শৈলেন তারাদাসের সাথে দু' এক পা' যেতেই তারাদাস তার মাথাটা দু'হাতে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললে "স্পাই।"

চোখে-মুখে অসীম বিস্ময় নিয়ে শৈলেনও প্রতিধ্বনি করলে—"স্পাই!"

কিন্তু তারপরই জিজ্ঞেস করল—"কই? কোথায়?"

চোখের ইঙ্গিতে তারাদাস শৈলনকে সাথে আসতে বলল। তারপর খানিকটা ভিড় ঠেলে চতুর্ভুজ ব্যূহের প্রায় ভিতরে ঢুকে একটি লোকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল—"ঐ।"

শৈলেন দেখল একটা লোক বসে খেলা দেখছে। বিদ্‌ঘুটে চেহারা। কালো রং। গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মাথার চুল সব যেন পাল্লা দিয়ে সম্মার্জনী-লাঞ্ছন হয়ে উঠছে। বড় বড় চোখ, কিন্তু কোটরগত ও তার চারধারে আধ ইঞ্চি চওড়া কালো বেষ্টনী। দাঁতগুলো উঁচু উঁচু—দুই ঠোঁটের মধ্যে চীনে-প্রাচীরের মত খাড়া হয়ে রয়েছে। মোট কথা মুখমণ্ডলে একটুও রস্‌কস্ নাই,—খট্‌খটে—চোয়াড় গোছের চেহারাখানা।

তারাদাস গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"নতুন এসেছে। ফলো কোরতে হবে—দেখতে হবে কার কার সাথে মেশে—কি করে।"

শৈলেন কৌতূহল বশে জিজ্ঞেস করল—"স্পাই, কেমন করে জান্লি, কে বলেছে ?"—

"ধীরেন দা"—তারাদাস আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়।

বিরাট হৈ হল্লার মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল। তারাদাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে লোকটীর উপর। সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। রক্তরাঙ্গা রবি অপূর্ব বঙিম ছটায় রাঙ্গিয়ে তুলছে পশ্চিমের আকাশ। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে পদ্মা গর্ভে। ঘোলা জলে লাল আভা পড়ে বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করেছে। মাঠ ভেঙ্গে লোক চলেছে পদ্মার ধারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন অতর্কিতে আঁধার আক্রমণ করেছে মাঠখানাকে।

তারাদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটীর দিকে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে চাদর গায়ে একটি যুবক ঐ লোকটীর কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলেই চলে গেল। তারপর এল একটি মোটা গোছের লোক। ঘনায়মান আঁধারে মুখখানি ভাল দেখা গেল না। এ লোকটী একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। তারপর সটান ঐ বসা লোকটীর কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেল।, শেষে এল একসাথে তিন চার জন। তারা সকলেই চোয়াড় লোকটীর কাছে বসে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ জুড়ে দিল। হঠাৎ তাদের একজন উঠে তারাদাসদের দিকে অগ্রসর হল। গতিক সুবিধের নয় বুঝে তারাদাস এইবার শৈলেনকে সাথে নিয়ে পদ্মার ধারে চলে গেল।

কিন্তু তার কোন সন্দেহই রইল না যে লোকটী স্পাই।

এরপর সুযোগ পেলেই তারাদাস লোকটীর সন্ধান করে। পথে, মাঠে দেখলেই তার পেছু নেয়। লোকটীও যেন তারাদাসকে দেখলেই তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে,- তারপর ঢেঁকী পাড় দিতে দিতে সরে পড়ে।

লোকটী ল্যাংড়া ছিল।

একটা পা কাঠির মত সরু। তা' ছাড়া যেন বিশালকায় দৈত্য। যেমন মোটা ঘাড় গর্দান,—তেমনি চওড়া বুকের ছাতি। বলিষ্ঠ হাত দু'খানিতে একটু আন্দোলনেই মাংসপেশী ফুঠে উঠে। সর্বোপরি মুণ্ডুটা যেন মা কালীর হাতে চমৎকার মানায়।

তারাদাস একদিন মনোরঞ্জনবাবুর কাছে লোকটীর আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল। বল্‌ল—"লোকটী সাংঘাতিক ধরণের স্পাই। ওর আশ পাশ দিয়ে চলা ফেরাও মুস্কিল। ব্যাটার কাছে একটা ছোট্ট ক্যামেরা আছে, দেখতে না দেখতে খুট্ করে ফটো তুলে নেয়।"

মনুদা তারাদাসকে বললেন—"তাইতো! তা হলেতো খুব বিপদ। দেখাতে পারেন আমাকে?"

"খুব। বেটা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় হয় কলেজ মাঠে, নয় পদ্মার ধারে আসে।"

মনুদা একদিন তারাদাসের সাথে গিয়ে দূর থেকে স্পাইটীকে দেখে এলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন—"এখন কি করা যায়।"

তারাদাস সোৎসাহে বল্‌ল—"করার মাত্র একটি পথই আছে,—সেটা হচ্ছে ওটাকে সরিয়ে ফেলা।"

"হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে।" চিন্তিতভাবে মনুদা বললেন।

* * * *

গণকপাড়া মহল্লার একটি বাড়ীর দুখানি ঘর ভাড়া নিয়ে জীবনদা থাকেন অনুশীলন সমিতির উত্তরবঙ্গ সংস্থার নায়করূপে কিছুদিন আগে তিনি রাজসাহী এসেছেন। জীবনদা'র ঘর দু'খানি সদর রাস্তা হতে কিছুটা দূরে,—ভিতরে। সেখানে সকালে, দুপুরে দুই একজন বাইরের লোক যাতায়াত করে। কিন্তু সন্ধ্যার পর জম্‌জমাট। প্রতি-দিন জীবনদা'র ঘরে ব্যায়ামের আখড়া বসে। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ

হাজারখানেক ডন ও হাজার দুয়েক বার মুগুর ভাঁজেন। লিকলিকে জিতেশ স্বচ্ছন্দে তাঁর পেটের উপর লাফ ঝাঁপ দেয়, দুই তিন জনে মিলে তাঁর ভাঁজানো হাত সোজা করার চেষ্টা করে। জীবনদা হাসেন আর বলেন—"না পারলে ফিজিক্যালি আন্‌ফিট বলে সমিতি থেকে নাম কেটে দেয়া হবে।"

একদিন সন্ধ্যায় মনোরঞ্জনবাবু এসে জীবনদা'কে বললেন—"আপনারে একটু হুঁসিয়ার হইয়া চল্‌তে ফিরতে কই।"

জীবনদা বলেন—"কিযের লাইগ্যা? স্পাই লাগ্‌ছে নাকি?"

"আরে না—না—" বলেই মনুদা হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন—"তারাদাস আপনারে ঠাউরাইছে স্পাই। কখন কি কইরা বসে—"

কথা শেষ হতে পেল না। জীবনদা বাধা দিয়ে বললেন "আমারে স্পাই ভাবছে? তারাদাস? হেই সরদার পোলাডা না?"

মনুদা ঘাড় নেড়ে জানালেন,—"হ্যাঁ।"

"হাচাই তো বিপদ দেখত্যাছি। অখন কি করণ যায়। শ্যাষকালে মাথায় বাড়ী দিয়া মারব নাকি? খাইছে রে—আমারে এক্কেরে খাইছে!"

এধারে তারাদাস স্পাইটকে সরানোর জন্যে জোর তাগিদ জুড়ে দিল মনুদার কাছে। মনুদা ক্রমাগতই একথা ওকথায় পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেদিন তারাদাস তার একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য জ্ঞানকে দেখল স্পাইটার সাথে আলাপ করতে, সেদিন সে প্রতিজ্ঞাই করে বসল স্পাইটাকে নিশ্চয় সরাবে সে।

মনোরঞ্জনবাবুকে অনুযোগের স্বরে বল্‌লে সে—"অর্গানিজেশন্‌টাকে গোল্লায় দিতে চান আপনারা? জানেন কি হয়েছে? সেই স্পাই বেটা জ্ঞানের সাথে আলাপ করছিল। আজ জ্ঞানের কাছ থেকে যদি কিছু বের করতে পারে—তাহলে কি অবস্থাটা হবে ভেবে দেখুন তো?"

মনোরঞ্জনবাবু এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—"তাইতো! বেটায তো দেহি অনেকদূর আগাইছে! আর তো দেরী করণ উচিত নয়। কিন্তু সরাম্ ক্যামতে। গুলী করলে ভযানক হৈ চৈ লাইগা যাইব গিয়া।"

এ সমস্যার সমাধান করে দিল তারাদাস: সে বলল—"গুলী কেন?" খাপসমেত একখানা ছোরা সে কোমর থেকে বের করল। ছোরাখানি মনুদা'কে দেখিযে আবাব রেখেদিল যথাস্থানে। তারপব চাপাগলায বলল—"ওর নিজের অস্ত্রেই ওকে বধ করতে হবে। জ্ঞানকে দিয়েই সন্ধ্যাব পর ওকে নিযে যেতে হবে পদ্মার ধারে নিরালা জাযগায। এক-খানি ভোজালিও ঠিক করে রেখেছি। তারপর আপনি আর আমি ব্যাটাকে এমনভাবে বসাব যে টুঁ শব্দ করাবও অবকাশ না পায। শেষে পাথর বেঁধে গড়িয়ে দেব পদ্মার জলে,—একেবারে গুম্।"

কিছুটা ভেবে নিযে মনুদা বললেন—"প্ল্যানডা চমৎকার হৈছে। কিন্তু শ্যাষে জ্ঞান তো বেইমানী কোরব না?"

"বলেন কি? এটা ঠিক জেনে রাখুন তেমন ছেলে বিক্রুট তারাদাস করে না। আজ জ্ঞান যদি বেইমানী করে তা হ'লে তার সামনে আমি নিজের বুকে ছোরা বসাব। কারণ আমি মনে করব আমি দেশের কাজের অযোগ্য,—আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নাই।"

"যদি তাই হয়, তা অইলে জ্ঞানের লগে হের আলাপ করণ দেইখ্যা অমন ঘাবড়াইছিলেন কিয়ের লাইগ্যা?" মনুদা প্রশ্ন করেন ঈষৎ হেসে।

"ঘাবড়াইনি মোটেই। আমি শুধু তাজ্জব বনে গিযেছি ব্যাটার সাহস আর ফন্দী ফিকিব দেখে। ও নিশ্চযই টের পেযেছে জ্ঞান দলের সভ্য এবং সে অনেক কিছুই জানে। কী ভযানক Dangerous লোক!"—জোরের সাথে জবাব দেয তারাদাস।

অনেক আলোচনার পর মনুদা বললেন "জ্ঞানেরে ঠিক করণের ভার আপনার। তবে এ সব কাজে উপরের Sanction লইতে হইব। কাল

রবিবার। বেলা ৪টায় শিরলের জঙ্গলে হাতীডোবা পুকুরের পাড়ে যে মন্দির আছে সেহানে যাইবেন। আমাগো দলের নর্থ ব্যাঙ্গলের হ্যাডার কাছে লইয়া যামু আপনারে। তেনারে সব বুঝাইয়া Sanction লইতে হইব কিনা।"

তারাদাসকে বিদায় দিয়ে মনুদা সোজা চলে এলেন জীবনদার বাসায়। হেসে জীবনদা'কে বললেন--"আপনার আয়ুদিন তো ঘনাইয়া আইছে। তারা তো আপনারে—ছোরা দিয়া খতম কোরবো ঠিক করছে।"

"খাইছে রে—একেরে খাইছে আমারে " বলে জীবনদা একচোট হেসে নিলেন প্রথমে। তারপর বললেন—"আনেন তো দেহি একবার ক্যামন ছ্যামড়াডা তারাদাস। আমারে খুন করতে চায়,—ক্যামন হে আখড়ার সর্দার দেখুম একবার।"

মনুদা বললেন—"হে ব্যবস্থা করছি। কাল বেলা চারডায় শিরইলের জঙ্গলে শিবমন্দিরে আপনার লগে তার দ্যাখা হইব "

ইতিমধ্যে পরেশবাবু (অমৃতলাল সরকার) আর পালোয়ান (সুরেশ চন্দ্র ভরদ্বাজ) এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের আসার কথা ছিল। প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর 'অথ তারাদাস উপাখ্যান' শ্রবণ করে তাঁরা বিমল কৌতুক উপভোগ করলেন—হেসে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়েন।

পালোয়ান বললেন—"আসছে কা'লের শিরইলের Scene দেখার জন্য আমি পাঁচ টাকার টিকেট কিনতে রাজী আছি।"

"কিন্তু তাই দেখার জন্য সকলে মিলে শিরোলে গেলে কৌতুক-নাট্য বিয়োগান্তও হ'তে পারে।" অল্প হেসে বললেন পরেশবাবু।

"বড্ড খিদা লাগ্‌ছে" বলে এইবার ঘরের কোণে রাখা ভাতের হাঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন মনোরঞ্জনবাবু।

জীবনদা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—"ওধারে যাইয়া কি হইব? ভাত নাই—রাঁধন লাগব।" মনুদা'র চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে

উঠল। অবাক্ হয়ে তিনি বললেন—"ভাত নাই। তার মানে? আরে—সন্ধ্যার আগে আমিই তো আমাগো চারজনের লাইগা কলা সিদ্ধ দিয়া এক হাঁড়ি ভাত রাইন্ধ্যা—ঢাইক্যা রাখ্‌ছি। হে গেল কৈ? কুকুরে খাইছে বুঝি?"

জীবনদা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন "আরে কুকুর না। বড় খিদা লাগছিল। আপনাগো খাওনের দেরী দেইখ্যা থাকতে রইলাম হাঁড়ি লইয়া। টুক্ টাক্ টুক্ টাক্ খাইতে খাইতে সব শ্যাষ হইয়া গ্যালো গিয়া। করুম্ কি? ভাত কোলে কইরা বইসা থাকন যায়? আচ্ছা কন দেহি আপনারা।"

জীবনদা পরেশবাবু আর পালোয়ানের দিকে চাইলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মনুদা বললেন—"এডা কন কি। তাজ্জব ব্যাপার দেখত্যাছি। চারজন জোয়ান মদ্দের খোরাক্ উঠাইলেন একা আপনি! তাও আবার কলা সিদ্ধ দিয়া! তারাদাস ক্যান মারবো না আপনারে কইতে পারেন? আপনারে মারণ উচিত। তবে প্যাট বইলা না,—রাক্ষস্ বইলা।'

পরেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। পালোয়ান হাসিতে যোগ দিলেন না—ভ্রূ কুঁচিয়ে মুখটা একধারে সরিয়ে নিলেন। মনুদা তাঁকে বললেন -"আপনে যেনি মুখডা কাঁচু মাচু কোরত্যাছেন। ব্যাপারডা কি কবেন তো?"

তাঁর বদলে উত্তর দিলেন জীবনদা। "রাক্ষস্ বইলা আমারে পিটাইলে উনিও যে বাদ যান্ না। খাওনের ব্যাপারে উনি আমার দাদা কি মিতা ঠিক কইতে পারিনা।"

এবার সকলে একযোগে হেসে উঠলেন।

পরদিন বেলা চারটের শিরোল জঙ্গলে প্রবেশ পথে তারাদাস মনোরঞ্জনবাবুর দেখা পেল। প্রায় তিন চার মাইল পরিধি নিয়ে বিরাট

জঙ্গল। বাঘ, শূযোর আর সাপের ভযে কেউ বড একটা ঢোকেনা ভেতরে। লতা গুল্ম আর বড বড গাছ সমাকীর্ণ এই বিরাট বনে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ পথ পায় না। ফলে মধ্যাহ্নেই প্রদোষের আবছায়া সেখানে বিরাজ করে।

"হাতীডোবায়"—কতকটা কাছে গিযেই হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনে তারাদাস চমকে উঠল।

"ও কিছু না" বলেই মনুদা তারাদাসের আগে আগে এগিয়ে চললেন। যতই তারা এগিযে যায, ততই আরো শব্দ শুনতে পায। পুকুর পাড়ে মন্দিরের কাছে এসে তারাদাস দেখতে পেল তিনজন যুবক রিভলভার দিযে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ করছে। একটি গাছের নীচু ডালে তিনটি জবাফুল ঝুলানো রযেছে—যুবক তিনজন পর পর সেই দিকে তাক্ করে পিস্তল ছুড়ছে। এদের মধ্যে একজন তারাদাসের পরিচিত ছিল। সে জাতিতে মাড়োযারী—নাম কৃষ্ণদাস বর্মন। কলেজে পড়ে,—বিবাহিত,—সাইকেলের পোকা, প্রতিবার সাইকেল রেসে প্রথম হয কলেজ স্পোর্টসে। তাকে দেখে তারাদাস মনে মনে খুব আনন্দিত হল।

মনুদা তারাদাসকে নিযে অগ্রসর হলেন এদের পেছনে ফেলে। গম্ভীর হযে বললেন—"এইবার নর্থ ব্যাঙ্গলের অর্গানাইজারের সাথে দ্যাখা হইব। তারে সবডা বুঝাইযা বলবেন।"

মন্দিরের পূব পাশে মনুদা'র সাথে তারাদাস গিয়ে দেখে দুজন লোক কথাবার্তা বল্‌ছে। অস্পষ্ট আলোকে দূর থেকে চেনা না গেলেও তার মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। একদম কাছাকাছি গিয়েই তারাদাস দেখে সেই স্পাইটা বসে রযেছে—আর তার সামনে জ্ঞান। মনুদা তারাদাসের অবস্থা দেখে ঈষৎ হেসে বললেন—"ইনিই হইত্যাছেন নর্থ ব্যাঙ্গলের অর্গানাইজার। রাজেন বাবুর বদলে কিছুদিন হইল এহানে আইছেন। এইবার কযেন আপনার কথা।"

হঠাৎ তারাদাস রাগে ফেটে পড়ল। চীৎকার করে বলল "ধাপ্পাবাজি! ইয়াবকি! নিজের লোকের সাথে এসব করার মানেটা কি?"

আর সে বলতে পারল না। ক্রোধে, ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পল,—কথা গলায় আটকে গেল।

জীবনদা উঠে হাত ধরে তাকে বসালেন কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন—"খুব অন্যায়। আমি কই কামডা খুবই অন্যায় হইছে। কিন্তু তোমারে একডা কথা কই তারাদাস। এ জগতে চূড়ান্ত ভালো আর চূড়ান্ত মন্দের বাইরের রূপ প্রায় একই প্রকারের। চূড়ান্ত লাল কাল আভা ধারণ করে, চূড়ান্ত মিষ্টি জিহ্বায় দিলে তিৎ লাগে। তাই বিচারডা করণ লাগে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া। স্পাই অপবাদ স্বাশসেবকের পক্ষে সব চাইতে বড অপবাদ। কারেও এডা ভাওনের আগে খুব ভাল কইরা ভাবন চাই—আকাট্য প্রমাণ পাওন চাই। আজ যদি তুমি আমাগো আপনার লোক না হইতা, যদি অন্য কোনও দলের লগে থাকতা—তা হইলে কি সর্বনাশ হইত কও দেহি। আমারে খুন লইয়া দুই দলে হইত শক্তি পরীক্ষা নিতান্ত নির্বোধের মত, বৃটিশ সরকারের কেশস্পর্শও করতাম না কেউ,—"বিপ্লব" পইড়া থাকতো একপাশে।"

কথাগুলো তো সত্যিই। লজ্জিত হল তারাদাস মাথা নীচু করে রইল সে।

এইবার জীবনদা বললেন—"ভুল চুক মানুষেরই হয় তা' লইয়া লজ্জার কিছু নাই। তুমি আমারে স্পাই ভাবছিলা। তাই আজ হইতে তোমারে আমি বানাইলাম স্পাই। রাজসাহীর সি, আই, ডি মহলের উপর তোমার নজর রাখতে হইব। তাগো activity তোমার দলবল লইয়া তুমি watch করবা,—প্রতিদিন খবর দিবা আমারে। অর্থাৎ আজ হইতে তুমি স্পাইয়ের উপর স্পাই,—মহাস্পাই।"

শান্তি ভাইয়া

অনাহারে, অনিদ্রায় ঘুরে ঘুরে,—অশেষ ক্লেশের মধ্যে বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী অতিক্রম করে দাসু, কালু (প্রবোধ বিশ্বাস) ও স্কলারের সাথে চপল চলে এল মজঃফরপুরে। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম না হলেও সকলেই সকলের চেনা জানা। নূতন বাঙ্গালী গেলেই চোখে পড়ে। সুতরাং সকলের ভোল বদলে গেল। শীতের দিন। তাই গায়ে চড়ল লম্বা কোট, মাথায় উঠল কাপড়ের অথবা বনাতের ভাঁজকরা টুপী,—ধুতিখানা পর্যন্ত কোমরে বেঁধে পা'ড়ের ঢেউ খেলিয়ে বিহারী কায়দায় পরা শিখতে হল বেশ লাগছিল চপলের এইরকম কোমর বেঁধে কাপড় পরা। পাড়াগাঁয়ের বাল্যজীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও সুবিধের বিষয় এই যে আর বেল্ট পরতে হয় না রিভলভার, পিস্তল সচ্ছন্দে গুঁজে রাখা যায় কোমরে। স্কলার আগে বিহারেই ছিল। তাই ঠেঁট বিহারী বনে গেছে। কোঁচা দেয়া দেখলেই সে বলে "উঁহু। ঐসে নেহি। উস্‌মে মালুম হোগা—

"মচ্ছী খাতা হায় জাত বাঙ্গালী—
জিস্‌কে ধোতি ঢিলী ঢালী।"

এতো এক রকম চলে। কিন্তু বিপদ হল কথা নিয়ে। হিন্দী বলতে হবে বাবা—চালাকী চলবেনা। স্কলার আইন জারী করল কেউ কখনো —এমন কি বাসায় পর্যন্ত বাংলা বলতে পারে না। যেমনই হোক হিন্দী বলতেই হবে। ফলে হিন্দী বাংলা মিশ্রিত দোঁআঁশলা ভাষা দেখা দিল সকলের মুখে। "হাম ভাত নাই রাঁধেগা,—তোমার বদন আচ্ছা নাহি হুয"—প্রভৃতি কথার সাথে সাথেই হাসির ধুম পড়ে যায়। একদিন চপল ভাত রাঁধছে আর গুণ গুণ করে গান গাচ্ছে—"ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।" স্কলার আড়ি পেতে শুনেছে

তাই। চপলের সামনে এসে আদেশের ভঙ্গীতে সে বল্লে—"য্যাসা গানা ম্যৎ কীজিয়ে জনাব! ইয়াদ রাখিয়ে ইযে আপ্‌কা বাংলা মুলুক নেহি হ্যয়—ইযে হ্যয় বিহাব। হিঁয়াপর ভারত মাতাকী গানা হোনা চাইয়ে য্যাসা"—বলেই সে গান জুড়ে দিল—

"সুন্দর সুভূমি ভাইয়া! ভারতকী দেশোয়া সে,
মোর প্রাণ রোয়ে উসী দুখেবে, বট হিয়া!—
একদ্বার ঘেরে রামা হিম কোতোয়াল সে
তিনদ্বার সিন্ধু ঘহরাবেরে, বটহিয়া।"

এই সব আনন্দের মাঝ দিয়ে দিন কাটছিল মন্দ না। এবারে স্কলার বিদায় নিয়ে চলে গেল কলকাতায়।

মাস দেড় পরের কথা। তখন বিহার প্রদেশের বিপ্লবী সংস্থাব নায়ক ক্ষেত্র সিংহ। সকলে ডাকে তাকে কর্তার সিং বলে। বাংলা দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দাস্থ, কালু, কর্তার সিং, চপল সব এসে জুটেছে নবদ্বীপে। হঠাৎ এক দিন বাসা থেকে হাত পঁচিশেক দূরে সদর রাস্তার উপর দাস্থ ও কালুকে একদল পুলিশ চেপে ধরল। হেঁপো রুগী কর্তাবকে নিযে চপল নদী পাব হযে সরে পড়ার জন্য নৌকায় চাপল। নৌকায আরও কযেকজন লোক খেয়া পার হচ্ছিল। একজন কর্তাব সিংকে জিজ্ঞেস্ করল—"আপনাবা যাবেন কোথায?"

"কেষ্টনগব" উত্তর দিলেন সিংজী।

"কেষ্টনগর কোথাব—কার বাড়ীতে?" আবাব প্রশ্ন।

"শরৎ রায় মোক্তারেব বাসায়"—ধাঁ করে বললেন কর্তাব সিং

"শরৎ বাবুর বাসা? সে তো আমার বাসার লাগা। চলুন একখানি গাড়ী ভাড়া করেই যাওয়া যাবে। বেশ হবে।" (তখনও রেল হয়নি)।

চপল মনে মনে প্রমাদ গণল। বেশ হবে! কিন্তু এযে ভেড়ে মারা বেশ হওয়া!

নদী পার হওয়াই ভদ্রলোক একখানি গাড়ী ভাড়া করে চপলদের ডাক দিলেন—"এই যে গাড়ী। আসুন আপনারা।"

কর্তার সিং হতভম্ব।

"আমি আসি" বলে চপল এগিয়ে গেল ভদ্রলোকটীর কাছে। ফিস্ ফিস্ করে তাঁকে যেন কি বললে সে। তারপরই ভদ্রলোকটী গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। চপল হাসতে হাসতে এসে কর্তার সিংকে বললে—"দিইছি ভাগিয়ে।"

তুই কি বললি?" প্রশ্ন করলেন সিংজী।

"কী আর। বল্লুম - আমার দাদার সিফিলিস্। তার উপর থাইসিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একসাথে যাওয়া কি ঠিক হবে?"—

"বটেরে পাজী কোথাকার! আমার সিফিলিস্ আবার থাইসিস্!" কৃত্রিম কোপের সাথে সিংজী বললেন।

"আরে জবরদস্ত সিফিলিস আর থাইসিসের নাম শুনেইতো হারকিউলিস্ পালিয়েছে! তা' না হলে কোর্ট অব জাষ্টিসে হাজির হতে হত যে।" চপল হেসে উত্তর করল

দুজনে আবার ফিরে এল মুজঃফরপুরে। আবার ফিরে এল বিহারী-জীবন। এইবার চপলের নাম গেল বদলে। বিহারে দলের লোকেরা তাকে জানল "শান্তিলাল নামে,—ছেলেরা ডাকে "শান্তি ভাইয়া" বলে। বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বর্মার দীনেশ বিশ্বাস ওরফে ফুজিদা সেখানে এসে হাজির হলেন কয়েক দিনের মধ্যেই। বাসায় ছয়জন লোক। তার মধ্যে মদন নামে এক বিহারী ছাত্র সভ্যও আছে। সেই বাজার হাট করে,—জল আনে আর বাইরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কখন কখন রাত্রে সিংজী আর শান্তি বাইরে বের হয়—দলের লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাত ও আলোচনা করার জন্য।

রাতে সকলে পালা করে পাহারা দেয়- বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে। দ'পাঁচেক

কার্তুজ আছে ১২ বোরের বন্দুকটার। আর রয়েছে গুটী তিন রিভলভার ও ছত্রিশ রাউণ্ড গুলী। বেশ চলবে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশ এলে হাসি মুখে ফিরে যাবেনা নিশ্চয়।

শান্তি রাতে পাহারা দেয় আর এই সব ভাবে। তার মনের কোণে সন্দেহও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা তো জীবন দিলাম—পুলিশেরও জীবন নিলাম। কিন্তু তারপর? এই দেয়া নেয়াতেই কি পূর্ণ হবে উদ্দেশ্য—সফল হবে বিপ্লবের আশা? তার মন যেন বলে নাটকের প্রথম অঙ্ক হয়তো এখানেই শেষ হবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি থাকতো বৈপ্লবিক জাগরণ,—আমাদের দেয়া নেয়া, এই সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ দেশ জুড়ে দাবদাহ সৃষ্টি করত;—বৃটিশের সুখের সাম্রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যেত সেই দাবানলে। চোখের সম্মুখে তার ভেসে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের ছবি। যে যেবেশে ছিল সেই বেশেই, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই অজস্র সাধারণ নরনারী ছুটে চলেছে ভৈরব হুঙ্কারে অত্যাচারের প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার ধ্বংসের জন্য,—আক্রমণ করেছে রাজপ্রাসাদ, অজস্র কণ্ঠের উন্মত্ত গর্জনে স্তব্ধ হয়েছে রক্ষী বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র, বিপ্লবী জনতার পুরোভাগে যারা ছিল তাদের দেহ গুলীর আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে ভূতলে,—কিন্তু জনতার তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই,—গতি তার অব্যাহত,—সে এগিয়েই চলেছে, এগিয়েই চলেছে। অবশেষে ব্যাষ্টিলের লৌহদ্বার ভেঙ্গে গেল জনতার চাপে,—রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হল জনতার দাপে। শান্তিলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—আর পাহারা দেয়।

কয়েকদিন পরে কামতাপ্রসাদ বাসায় এসে খবর দিল—"স্পাই যেন লক্ষ্য কর্চ্ছে বাসাটা। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।"

বাসা বদলানোই ঠিক করা হল। কামতা একটা বাসাও ভাড়া করে এল। সন্ধ্যার পর মাল পত্তর সেখানে পারও করা হল। কিন্তু কর্তার সিং হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সেই রাতেই বাসা পরিবর্তন করা সম্ভব হলনা।

রাতে কারো খাওয়া হয়নি। খুব ভোরে উঠে ফুঙ্গিদা ভাত চাপিয়েছেন। সবে মাত্র ফরসা হয়েছে। হঠাৎ মদন বলে উঠল 'ভাইয়া। House তো raid হো গিয়া"—

শান্তিলাল দৌড়ে গেল জানালার ধারে। সত্যিইতো! পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাসা। এখন উপায়! নীচ তলার প্রতিটী দুয়ারে শিকল চড়ানো। ঠিক হল সব একযোগে লাফিয়ে পড়তে হবে দোতালা থেকে। যে বাঁচে আর যে ধরা পড়ে। চক্ষুর নিমেষে ফুঙ্গিদা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটা নিক্ষেপ করলেন বাহিরে। হাঁড়িটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই পুলিশের বেষ্টনীতে ফাটল ধরে গেল। সেই ফাঁকা স্থানে পর পর ছয়জন পড়ল লাফিয়ে। দৌড় দিয়ে একটু যেতেই দুজন পুলিশ কনেষ্টবল সিংজিকে চেপে ধরল। শান্তিলালের হাতে ছিল একটা বাঁশের টুকরো। গায়ের জোরে তাই দিয়ে একজন সিপাহীর পিঠে বসিয়ে দিল এক ঘা'। তারপর দে ছুট্।

একঘণ্টা পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সব ধরা পড়েছে,—বেঁচেছে মদন আর শান্তিলাল।

সিংজী, ফুঙ্গীদা প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করা হল ১০৯ ধারায়। এর ফল কি তা' তো জানাই আছে। তবু মামলা চালানোই স্থির করল শান্তিলাল রাম বিনোদ, ধ্বজাপ্রসাদ, কামতা প্রভৃতি বিহারের বিপ্লবী কর্মীরা। মহা মুস্কিল। শান্তিলাল বললে—"মামলা তো মামলা—আরে পাটি ক্যায়সে চলে, মেরে সমঝমে তো নাহি আতা। রূপেয়া কাঁহা?

রাম বিনোদ বিহারের বিপ্লবী ছাত্রদের অবিসংবাদী নেতা। তিনি বললেন—হাম পানশোকী ইন্তেজাম কর দেঙ্গে। প্রফেসর রূপালিনীজীকে আনেকে বাৎ হ্যয়। একদফে উনহোনে পানশো দে চুকা,—ফিন্‌ভি কুঁচ্ মিলনে কি উমিদ হ্যয়। প্রফেসর মালকানি থোড়া বহোৎ মদৎ দেঙ্গে। প্রফেসর কৃপালিনী পরে রাষ্ট্রপতি, প্রফেসর মালকানি গুজরাট বিদ্যাপিঠের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

শান্তিলালের প্রাণে ভরসা এল। তবু সে বললে—'ওতে হবে না, আরও টাকা চাই। বিহারের প্রত্যেকটা জেলায় অর্গানিজেশন চালাতে মাসে প্রায় দুইহাজার টাকা চাই। তার উপর অস্ত্র সংগ্রহ তো হাতীর খোরাক। এত টাকা কোথায় পাব?

ঠিক এই সময় দাশু চাটার্জিকে সাথে নিয়ে ব্রজেন বাড়ুয্যে ঘরে প্রবেশ করল। ব্রজেন নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল—"মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারাণা।"

সকলে হেসে উঠল।

কিন্তু বাস্তবিকই টাকা মাটী ফুঁড়ে উঠল। দাশুর বাবা মেজেতে গাড়া সিন্দুকে প্রায় তিন হাজার টাকা রেখেছিলেন। একদিন দাশু তার সমস্তটাই নিয়ে এসে শান্তিলালের হাতে দিল। টাকাতো হল। এইবার উকিল যোগাড় করা চাই নামজাদা উকিল কালী বসু ক্ষুদিরামকে সমর্থন করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর ব্রজেনকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিলাল গেল সেখানে। ব্রজেন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল—শান্তিলাল গেল বৈঠকখানা ঘরে। কালীবাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন। শান্তিলালকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি চাও?"

"আমি একটা কেসের সম্পর্কে আপনার কাছে এসেছি"—শান্তভাবে উত্তর দিল শান্তিলাল

"বলুন"—

এবার ধীরে ধীরে শান্তিলাল বুঝিয়ে বলে—"কয়েকদিন আগে এই শহরে চারজন বিপ্লবী ধরা পড়েছে বোধ হয় জানেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে মামলা চলছে। আপনাকে আসামী পক্ষ সমর্থন করতে হবে।"

"আসামীদের মধ্যে কেউ আপনার আত্মীয় আছেন বুঝি"—জিজ্ঞাসু-নেত্রে কালীবাবু চাইলেন শান্তির দিকে

"না।—আমিও দলের সভ্য"—শান্তি বুঝিয়ে বলে।

কালীবাবু বললেন—"একটু বসুন।"

তারপর আলমারীর ড্রয়ার খুলে একটি বোতল আর গ্লাস বের করলেন। সোডার বোতল সামনের টেবিলেই ছিল। এইবার গেলাস গেলাস মদ আর সোডা ঢালেন আর ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে যান। শান্তিলাল হতভম্ব। প্রায় আধ বোতল মদ সাবাড় করে কালীবাবু তাকালেন তার পানে। বেশ আয়াসের সাথে বললেন—"হুঁ"—তারপর?"

শান্তিলাল একদম হতবাক্। চোখের সামনে এমন মদ খাওয়া সে জীবনে দেখেনি।

কালীবাবু এইবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা—আপনারা মাতালকে বিশ্বাস করতে পারেন?"

শান্তি সংযতভাবে উত্তর দিল—"আমি মাতালের কাছে আসিনি—উকীলের কাছে এসেছি, যে উকীল বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামকে সমর্থন করেছেন।"

ক্ষুদিরামের নাম শুনেই কালীবাবু থমকে গেলেন। অনুচ্চস্বরে বার কয়েক উচ্চারণ করলেন—"ক্ষুদিরাম,—ক্ষুদিরাম।" তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"আপনাদের কি জীবনের মায়া নেই?"

"দেশের মায়া জীবনের মায়াকে আচ্ছন্ন করেছে। আমাদের আত্মাহুতি যদি দেশাত্মার মুক্তি আনতে পারে,—সার্থক হবে আমার জীবন।" উত্তর দিল শান্তিলাল।

হঠাৎ কালীবাবুর চোখ মুখের ভাব পরিবর্তিত হল। এক হিংস্রদৃষ্টি দেখা দিল তাঁর চোখে, ক্রুর হাসি ঝলকে উঠল মুখে। সহসা তিনি বলে উঠলেন—"যদি এখন ধরিয়ে দি"—

তড়াক করে শান্তিলাল দাঁড়িয়ে গেল। চক্ষুর নিমেষে একটি রিভলভার

বের করে—কালীবাবুর দিকে তাক্ করে বলল—"তার আগে আপনার জীবন দিতে হবে।"

হো হো করে কালীবাবু হেসে উঠলেন। বললেন—"My dear friend! you came to me without any introduction So I was testing whether you are a real man."

"I hope I have come out of the test successfully."—শান্তিলাল উত্তরে বললে। রিভলভারটা নাচিয়ে বল্ল—"And this little weapon served as my introduction.

তারপর মোকদ্দমার কথা, বিহারের বিপ্লব দল সম্প্রসারণের কথা অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে আলাপ হল। কালীবাবুর মাস মাস আড়াইশো টাকা তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মুঙ্গেরে কয়েকটি রিভলভার পাওয়া যেতে পারে খবর পেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে শান্তি রওনা হল মুঙ্গেরে। সঙ্গে আছে গুরুজী (শচীন বক্সী)। ট্রেণের মধ্যে এক বিহারী ভদ্রলোক গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ে দিল শান্তিদের সাথে।

'বাংগালসে এক বোমগোলাওয়ালা আযা বিহারমে। য্যাসা হুজ্জতী লাগাযা উস্‌নে—ক্যা কহে। জেবাসা ভি মোওক্কা নাহি মিলতা আরাম কী,—হামেসেই ঢোঁড়ো আউব ছোটো।"

শান্তি বলল—"হাম লোগোঁকে নজরমে আনেসে আপকো জরুর খবর দে দেঙ্গে,—আবি বাতাইযে তো আপ কাঁহা বহতে হেঁ।"

কোন রকমে লোকটির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে উভয়ে উপস্থিত হল মুঙ্গেরে। রাজকুমার সিংয়ের মারফত কয়েকটা যন্ত্রও পাওয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একদা সন্ধ্যায় বাসা ঘিরে ফেলল পুলিশ। গুলীর মুখে উভয়ে পথ করে নিল। হাটা পথে রওনা হল ভাগলপুর অভিমুখে।

শীতের দিন। উভয়ের গায়েই গেঞ্জি আর পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কিছু

নাই। ফলে জামালপুর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এসেই উভয়ের পা নেতিয়ে পড়ল। একটা আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পল উভয়ে। প্রচণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপছে।

পেটে ভাত নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, উপরন্তু এই দারুণ শীত। প্রথমে দুজনে দুজনের গা মাসেজ করে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা পেল। তাতে ব্যর্থ হয়ে নীরবেই হেসে নিল তারা। আবার বাগান থেকে পথে বেরিয়ে এল। চলতে লাগল হাত ধরাধরি করে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড়ের ভিতর কাঁপুনি আনে। স্রেফ মনের জোরেই চলতে লাগল তারা। শান্তিলাল সাথীকে বললে--"এ গুরুজী! শুনিয়ে। ইসমে মালুম হোগা কোন পাপী হ্যয়। পাণ্ডবোঁ কো স্বরগ যানেকা বাত ইয়াদ কীজিয়ে। যো জ্যাদে পাপী হ্যয় উও পহেলে গিরেগা।"

পরদিন বেলা প্রায় দশটায় পৌছুল তারা ভাগলপুর। বিশিষ্ট সভ্য—আইনের ছাত্র ধ্বজাপ্রসাদ শাহুর ঘরে আশ্রয় নিল দুজনে।

ক্রমে ভাগলপুর বিহারের কেন্দ্র হল। দলের বিশিষ্ট নেতা রামবিনোদ সিং (বর্তমানে আইন সভার সদস্য) বেতিয়ার হেড মাষ্টার, মুজঃফরপুরের রাওজী. (রাম দত্ত সিং A. S. I) ভাগলপুরের মদনগোপাল যোশী রাসবিহারীলাল (বর্তমানে এম্, এল, এ), ধ্বজাপ্রসাদ, মুংগেরের দেবেন দাসগুপ্ত আরও সকলেই উৎসাহের সাথে কাজে লেগে গেলেন। বিহারের বিপ্লবী নেতাদের এক বৈঠকে শান্তিলাল প্রস্তাব করল ধর্মের আবরণে বৈপ্লবিক ভাব প্রচারের জন্য জন কয়েক প্রচারক সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহারও ছাড়তে হবে। রামবিনোদের মনে গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি সোৎসাহে সায় দিলেন।

ধ্বজাবাবুর বাসায় প্রবেশের পথে একদিন একটি লোক গুরুজীকে প্রশ্ন করল—"তুম কোন হ্যয়? কেয়া নাম?"

ব্যাপাব ভাল না' সন্ধ্যাতেই শান্তিলাল আর গুরুজী সহরের উপকণ্ঠে নাথনগরে এক চাষীব গৃহে আশ্রয় নিল। সেখানে সকলের সাথে মাঠে কাজ করে গুরুজী আব শান্তিলাল। মুখে মুখে প্রচার করে বিদ্রোহের ভাব,—আব মাঝে মাঝে জটলা করে সকলকে পড়ে শোনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "প্রতাপ"। কিষাণেব খাদ্য—ছাতু, ভুট্টা ঝলসানো আর জোয়াবীর রুটী খায় তাবা, আব পরিধান করে মোটিযার কামিজ, ময়লা মোটা অপ্রশস্ত ধুতি। সন্ধ্যাব পব কেউ তাদেব দেখতে পায়না। ছাপ ধুতি, কামিজ পবে, মাথায় টুপী দিয়ে ভদ্রলোক সেজে তাবা প্রাযই যায় সহবেব দিকে

তাদেব আশ্রয়দাতা মহাবীব একদিন গরুব খোঁজে নাথনগব গড়েব কাছে গিযে দেখে গড়েব নীচে এক নিবালা স্থানে দুটী লোক আলাপ কোরছে। সন্ধ্যাব আঁধারে ঠিক চেনা যায না কাছে গিযে জিজ্ঞেস কবল—"কোন হায।"

"হাম হায ভাইয়া"—উত্তব দিল শান্তিলাল মহাবীব অবাক্ হয়ে গেল। শান্তিলাল গড়েব একজন সুবাদাবেব সাথে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। কিষাণেব ছেলে শান্তিলালের সুবাদারেব সাথে এত কি কথা থাকতে পাবে সে ভেবেই পাযনা

দিন দশেক পবে নাথনগবে জোব কলেবা লেগেছে। প্রতিদিন দু'টো একটা মবছে। গুরুজী আর শান্তিলাল পাড়াব কয়েকটি ছেলে নিয়ে লেগে গেছে সেবাকাযে। বোগীব শুশ্রূষা তো আছেই। তাব উপবও বাড়ী বাড়ী গিযে কিভাবে চলতে হবে, কি কি খেতে হবে, বাড়ীঘব কেমন কবে বাখতে হবে বলে এল। গাঁযের এক বুড়ো মাতব্বর এই সব দেখে মন্তব্য কবল—"এ দুনো কোন্ ছৌ বে। দুসৃরে কে বাস্তে মবণ কবুল কবাইছে,—য়্যাসা কাম তো হাম কভি ন দেখাইছি জীন্দিগীমে।"

মহাবীরের বাড়ীতে শীতের রাতে খোলা বারন্দায় থাকতে হয়। তাই দলের সভ্য পাঠশালার পণ্ডিত মাহেশ্বরীলাল নাথনগর গড়ের নীচেই একটা বাসা ভাড়া কোরলেন। সেখানেই শান্তিলাল আর গুরুজী থাকতে লাগলো। এই বাসায় একদিন খুব মজার ব্যাপার ঘটে গেল। বেলা তখন দশটা হবে, পণ্ডিতজী গিয়েছেন পাঠশালায়। গুরুজী ভাত পাক্ কর্চ্ছেন পাক্ঘরে। শয়নঘরের বারন্দায় বসে শান্তিলাল 'প্রতাপ' পড়ে শোনাচ্ছে ব্রজেন বাড়ুয্যেকে। ব্রজেন দু দিন হল মুজঃফরপুর থেকে সেখানে এসেছে। গেটের দোরটা ভেজানো রয়েছে। হঠাৎ দোর খুলে একদল পুলিশসহ একজন অফিসার প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজেন ঘরের ভিতরে গিয়ে রিভলভার নিয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হল। শান্তিলাল তার দিকে চেয়ে দেখে সে ট্রিগারে হাত দিয়েছে। হাতের ইশারায় বারণ করে শান্তিলাল এগিয়ে গেল পুলিশ অফিসরটীর কাছে। কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল—কেয়া মাংতে? অফিসরটীর চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বোলল—"এ ডেরা হাম তো কেরায়া লিয়া"—ইতিমধ্যে দুটো কাপড় ঘেরা ডুলি এসে নামলো আঙ্গিনায়।

শান্তি এবার কর্কশ কণ্ঠে বোলল "দিল্লাকীকে যাগা নাই মিলা? আভি নিকাল যাইয়ে,—নিকাল যাইয়ে।"

এরই মধ্যে ঝড়ের মত পণ্ডিতজী এসে হাজির। তিনি ব্যাপার বুঝে সপ্তমস্বরে এমন সব সাধুভাষা প্রয়োগ করলেন যে দারোগাজী ডুলী তুলে নিয়ে তো ভাগলেনই,—শান্তি আর ব্রজেনও কাণে আঙ্গুল দিল।

বিপদ তো কাটলো। কিন্তু গুরুজী কোথায়? ভাত পোড়ার গন্ধে সবার দৃষ্টি পড়ল পাকঘরে। ব্রজেন ছুটে এসে খবর দিল গুরুজী নাই।

পণ্ডিতজী এর সমাধান করে দিলেন। তাঁর কথায় জানা গেল তাঁকে house raid এর খবর দিয়েই গুরুজী এক বস্ত্রে ছুটে চলে গিয়েছেন ভাগলপুরে এই দুঃসংবাদ বহন কোরে। সন্ধ্যার পর শান্তি তাঁকে বের

কোরলো ঘোশীর বাড়ী থেকে। তারপর খুব হাসাহাসি। ব্রজেন এবারে শান্তিকে জিজ্ঞাসা কোরল—গুলি করতে কেন নিষেধ করলেন? কি করে ঠিক পেলেন পুলিশদল আমাদের ধরতে আসেনি?

শান্তি বোললে—"তুমি তো আজ আমাদের বারোটা বাজিয়েই দিয়েছিলে। গুলী কোরলে আর রক্ষা ছিলনা। প্রথমে তো আমিও ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু চট করে লক্ষ্য কোরলাম পুলিশের হাতে বন্দুক নাই। আর ধরতে এলে যে ক্ষিপ্রতা আর আয়োজন দরকার ওদের হাবভাবে তার অভাব বোধ হল। দারোগা বেচারা যেন থতমত খেয়ে গেছে আমাদের দেখে। তাই ধাঁ করে মনের মধ্যে খেলে গেল এটা comedy of errors. পাছে tragedyতে পরিণত না হয় তাই তোমাকে ইসারায় বারণ করেছি গুলি কোরতে। কিন্তু তবুও এখনই নাথনগর ছাড়তে হবে। দারোগা সাহেব বিবি নিয়ে এসেছিলেন—তাঁকে আর কষ্ট দিলে ধর্মে সবেনা।

আবার তারা ফিরে গেল ধ্বজাবাবুর বাসায়। সেখান থেকে শান্তিলাল কোথায় চলে গেল,—কেউ পাত্তা পেলনা। দশ পনর দিন পর ভাগলপুর শহরে জোর গুজব একজন ফিরিঙ্গী যুবক রিভলভার সমেত ট্রেণের কামরায় ধরা পড়েছে। নাম বলেছে উইলিয়াম লোরী। ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশসাহেব, জেলসুপার সবাইকে সে গরম গরম বাৎ শুনিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ উইলিয়াম তার নাম নয়। কিন্তু সে যে কে—ঠিক করা যায়নি।

১৯১৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর তার বিচারের দিন। সেদিন তাকে কোর্টে হাজির করা হবে। ফলে 'সাহেব স্বদেশী' দেখার জন্যে কোর্ট লোকে লোকারণ্য। এস, ডি, ও মৌঃ সরাফুদ্দিনের কোর্টে উইলিয়ামকে সত্যিই হাজির করা হল। হাকিম জিজ্ঞেস করলেন—"Have you got any defence—any lawyer to defend you?

নির্লিপ্ত স্বরে আসামী উত্তর দিল—"Man cannot defend a man. Lord will speak through me when the time of defence comes."

ধ্বজাবাবু, ব্রজেন, যোশী অনেক দূরে ছিল। আসামীকে ভাল করে দেখতে পায়নি। এবার তার কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল। ভিড় ঠেলে অগ্রসর হোয়ে তারা দেখতে পেলো সাহেবী পোষাকে কাটগড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শান্তি ভাইয়া।

প্রায়শ্চিত্ত

১৯২০ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হোয়েছে। যুক্তপ্রদেশের মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নায়ক আর্য সমাজী পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিস্মিলও মুক্ত হোয়ে নিজগৃহ শাহজাহানপুর এসেছেন। ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী,—ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে লিপ্ত ছিল এবং,—কি ভীষণ! তাই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ বড় ঘেঁসেনা এঁর কাছে। সহসা একদিন সন্ধ্যার পর এক মুসলমান যুবক এল তাঁর গৃহে। যুবকটী সোজাসুজি প্রশ্ন কোরল—"আমাকে নেবেন আপনাদের দলে।"

বিস্মিত রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা কোরলেন—"আপনার নাম?"

"আস্‌ফাক্‌উল্লা"—জবাব দিল যুবক।

"আপকা মাকান্?"

"আপ না কহিয়ে—কহিয়ে তুম! নাম ইসি শহরকা রহনেওয়ালে" —জবাব দিল যুবকটী।

রামপ্রসাদের মনে সন্দেহ দোলা দেয়। তাঁর আর্যসমাজী সংস্কার মনের মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মেরে বলে—বিশ্বাস কোরোনা মুসলমানকে। রামপ্রসাদ ইতস্ততঃ কোরে বলে "ম্যয় হালমে বাহার আয়া—বাহারকী হালচাল কুচ্ ভি মুঝে মালুম নেহি। দুচার রোজ বাদ আও দোস্ত।"

আস্‌ফাক মাঝে মাঝেই যায় রামপ্রসাদের কাছে। রামপ্রসাদ প্রায়ই তাকে ছুতোনাতা কোরে বিদেয় করে। আসল কথা এড়িয়ে চলে।

একদিন বিরক্ত হোয়ে আস্‌ফাক বললো "কহিয়ে তো পণ্ডিতজী! ইয়ে দেশ কেয়া সিরফ হিন্দুয়োঁকো দেশ হ্যয়—না ইয়ে হিন্দু মুসলমান দুনোকো?"

রামপ্রসাদ আস্‌ফাকের অন্তরের উত্তাপ অনুভব কোরলেন এই উত্তাপের স্পর্শে রামপ্রসাদের মনের সংশয়,—সংস্কার, বাধা ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে গেল। আকৃষ্ট হোলেন তিনি যুবকটীর প্রতি। হাসিমুখে বোললেন তিনি "ইয়ে দেশ হিন্দুয়োঁকো নেহি, মুসলমানোকো ভি নেহি। ইয়ে হ্যয় হিন্দুস্থানকে রহনেওয়ালে হিন্দুস্থানীয়োকো দেশ। ইয়ে দেশ হ্যয় তুমহারা, হামারা সব কোইকো। ইসকী সেবামে সব কোইকো অধিকার বরাব্বর হ্যয়।" আস্‌ফাককে দলে নেয়া হল।

হৃষ্টচিত্তে আস্‌ফাক্ ফিরে এল নিজ গৃহে। তার মনের খুশী আর ধরে না কাঙ্গালের মর্মজোড়া আকাঙ্খার সামনে যেন প্রচুর চিত্ত এসে জুটেছে,—চিত্ত সন্তোষে ভরে উঠেছে কাণায় কাণায়

এরপর থেকেই সুরু হল আসফাকের বিপ্লবী জীবন। কাজ—কাজ—কেবল কাজ কোরে যায় সে। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নাই। কোনদিন খাওয়া হয়—কোনদিন হয় না। কোন দিন ষাইট, সত্তর, আশী মাইল সাইকেল চালায়,—দূর দূরান্তরে বহন করে বিপ্লবের বাণী। তবুও যেন তার তৃপ্তি নাই,—তার মন চায় কাজের চাপে পিষে মরতে।

আস্‌ফাক্ ছিল প্রকৃত মুসলমান। কোরাণের প্রতি ছিল তার অসীম

ভক্তি। কোরাণের পবিত্র বাণী ছিল তার কণ্ঠস্থ। সে প্রায়ই বোলত "যে প্রকৃত মুসলমান সে পরাধীনতা সহ্য কোরতে পারে না। সঙ্কীর্ণ হৃদয় হোতে পারে না।"

তাই দেশ মুক্তির আন্দোলনে মুসলমান সমাজের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা তার মনে ব্যথা দিত। কিন্তু কাজের আকুলতা আর গুরু রামপ্রসাদের প্রতি অগাধ ভালবাসা তার মনের সব শূন্য কোণগুলি পূর্ণ কোরেছিল। রামপ্রসাদ আর তার কাছে পণ্ডিতজী নাই—হোয়ে গেছে শুধুমাত্র 'রাম।'

মন যতই দুর্বার হোক—দেহেরও একটা দাবী আছে কিন্তু বৈপ্লবিক দেশ কর্মীরা কতকটা অভাবে কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে এই দাবী উপেক্ষা কোরেই চলে। রোদ, বৃষ্টি, আহার নিদ্রা উপেক্ষা কোরে চলার তাগিদেই চলতে থাকে তারা। অকস্মাৎ কল যায় বিগড়ে তখন আসে আক্ষেপ, আসে ক্রোধ নিজের অক্ষম দেহটার উপরে। মনের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না এই জড়ভরত দেহটা—যাক্-যাক্ -এটা শেষ হয়ে। থাক্ শুধু আদর্শের অমিতবীর্য—সঙ্কল্পের অশরীরী রূপ।

দেহের উপর নিয়ত অত্যাচারে আসফাকের দেহ পীড়িত হল। অচল হয়ে শয্যা গ্রহণ কোরল সে। জ্ঞান লোপ পায় মাঝে মাঝে। কিন্তু তার অবচেতন মানসে কর্মের প্রবাহ ছিল অব্যাহত। তাই বিকারের ঝোঁকে বকেই চলেছে 'রাম' 'রাম।'

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব শঙ্কিত হলেন। মুসলমানের ছেলে অচৈতন্য অবস্থায় জপ করে রাম রাম! এ যে বিষম কাণ্ড! নিশ্চয় রাম জিন বা রাম-দানাতে ধোরেছে!!

মোল্লা এল, মৌলবী এল, চারিদিক থেকে,—ওঝা এল জিনের প্রভাব থেকে আস্‌ফাককে বাঁচানোর জন্যে। চল্‌লো ঝাড়া, ফুক, তাবিজ, কবচ, জলপড়া। যতবারই আস্‌ফাক বলে 'রাম' ততবারই তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে শোনানো হয় 'আল্লা' 'আল্লা।'

আসফাকের অসুখের খবর পেয়ে একজন সহকর্মী তাকে দেখতে এসে এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি খবর দিল রামপ্রসাদকে। রামপ্রসাদ এসেই দেখলেন আসফাক বিকারের ঘোরে বকছে "রাম" আর তার কানে শুনানো হচ্ছে আল্লা, আল্লা। রামপ্রসাদ তৎক্ষনাৎ আসফাকের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। মন্ত্রের কাজ কোরল এই স্নেহস্পর্শ। আসফাক শান্ত হল। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তার রোগের গতি চলল ভালোর দিকে।

যুক্ত প্রদেশে বৈপ্লবিক সংস্থা পুনর্গঠনের ভাব নিয়ে বাংলা থেকে যোগেশ চাটার্জি এসেছেন। প্রদেশের দায়িত্ব তিনি অর্পন করেছেন পণ্ডিত রামপ্রসাদের হাতে। আসফাক তাঁর প্রধান সহকারী। একদিন তিনি আসফাককে ডেকে বল্লেন টাকা চাই। টাকার অভাবে সব কাজ শেষ হতে বসেছে। আমি ঠিক করেছি ট্রেন থেকে সরকারী টাকা লুটতে হবে

আসফাক একটু ভেবে নিয়ে বললে—ওতে তো বিপদ ডেকে আনা হবে। আর ডাকাতি—মনটা কেমন করে যেন। রামপ্রসাদ বোল্লেন নীতির প্রশ্ন একদম ঝুটা। নীতির দিক দিয়ে কোন কিছুতেই বিপ্লবীর আটকায় না যদি তা অগ্রগতির সহায় হয়। আর ডাকাতি না করে করিই বা কি! অর্গানিজেশন চালাতে হলে টাকা চাই।

আস্ফাক্ আর আপত্য কোরল না। হেসে গান ধরল—

"তুঝসে ম্যয়নে দিল কো লাগায়া—
যো কুচ হুয় সো তুহি হুয
বহুৎ সমায়কে তুঝকো পায়া
যো কুচ হুয রাম! তু হি হুয় "

রামপ্রসাদ নিজের দুই বাহু আসফাকের স্কন্ধে রেখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার মুখ পানে, তারপর ধীরে ধীরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে

খুব মৃদুস্বরে বোললেন "আস্‌ফাক্! আস্‌ফাক্! তু হামারা জনম্ জনমকে ভাই—মেরা জনম্ জনমকে ভাই—

শিহরিত হল আস্‌ফাকের সর্বদেহ। চোখে এল জল—মুখে সরলোনা কোন কথা—শুধু অস্পষ্ট, জড়িতভাবে উচ্চারিত হোল "রাম—রাম"

*   *   *

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। রাত্রি প্রায় ৮টা। লক্ষ্ণৌ শাহারণপুর লাইনে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ কাকোরী ষ্টেশন থেকে পূর্ণ বেগে অগ্রসর হচ্ছে আলমনগরের দিকে। হঠাৎ তার গতি গেল থেমে। কে সেই শেকল টেনে ট্রেণ দিয়েছে থামিয়ে। সাথে সাথেই দশ বারটী যুবক গাড়ী থেকে নেমে পল নীচে। তাদের দেখাদেখি অনেক যাত্রীও নেমেছে—গার্ড সাহেবও নীচে নেমে হাতে আলো নিয়ে অগ্রসর হোয়েছেন কিছুটা। একজন যুবক তাঁর কাছে গিয়ে আদেশের স্বরে বোলল—"ঠাহর যাও।" তারপর চীৎকার করে বোলল—যাত্রী ভাইয়োঁ—আপ্‌লোগ আপন্ আপন্ কামরেমে উঠ যাইয়ে। হামসব সরকারী খাজানা লুটেঙ্গে—ইয়ে নাহি—মাংতেঁকে কিসিকো জানসে নোকসান পৌঁছ।" ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল উঠে পল আপন আপন কামরায়। গার্ড সাহেব ও যাবার উদ্যোগ কোরছিলেন। কিন্তু যুবকটী তাঁকে আদেশের স্বরে বোল্‌ল—"তুম ঠাহরো দোস্ত।" গার্ড সাহেব দেখলেন যুবকের হাতে পিস্তল চক্ চক কোচ্ছে। বসে পলেন তিনি মাটীতে।

ক্ষিপ্রতার সাথে যুবকদল মেইল ভ্যানের লোহার সিন্ধুক ভেঙ্গে টাকার থলে আর মেল ব্যাগ থেকে ইনসিয়োরগুলি নিয়ে অন্ধকারের আবরণে উধাও হল।

এই য্যাকশানের অধিনায়ক ছিলেন রামপ্রসাদ আর তাঁর প্রধান সহকারী আস্‌ফাকউল্লা।

সুরু হয়ে গেল খানাতল্লাস ও ধরপাকড়। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা

তিনটী প্রদেশ যুড়ে আবিষ্কৃত হল ষড়যন্ত্রের সূত্র। রামপ্রসাদ আর তাঁর সাথে আরও প্রায় চল্লিশ জন গ্রেপ্তার হোল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে। পুলিশ কিন্তু আস্‌ফাকের সন্ধান পেলনা—তার নামে গ্রেপ্তারী পরোযানা বের হল। সুরু হল আস্‌ফাকেব ফেবারী জীবন। এব পব থেকে কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো শিখ, কখনো কাবুলী কখনো বাঙ্গালীব বেশে সে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে।

১৯২৬ সালের প্রথমভাগে বাংলাদেশের জনৈক ফেরাবী বিপ্লবীর সাথে আসফাক এসে হাজির হল ঢাকা শহরেব রাজাবদেউডীতে দলেব সভ্য সুধীর সবকারেব বাসায়। সুধীর জানে উভয়েই বাঙ্গালী। আস্‌ফাক্‌কে জানে সে বীরেন নামে। বীরেনবাবু বেশ বাংলা বোলে যান্—কিন্তু মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে বেড়িয়ে পড়ে হিন্দুস্থানী টান। অবাক্ হোয়ে সুধীব তাকায় তাঁর মুখের দিকে। বীরেনবাবু নিজের গলদ বুঝতে পেবে বলেন—পশ্চিমে থাক্‌তে থাক্‌তে একদম পশ্চিমা বনে গেছি।

বিপ্লব দলে তখন ভাটার টান। বেঙ্গল অর্ডিনান্সে উজাড কোরে ধোরেছে বিপ্লবীদের। গুটীকয মাত্র বিশিষ্ট কর্মী ফেরারী হযে কোনও ক্রমে সংস্থা বজায় বেখেছে। এই সময় বীবেন প্রায়ই বৈদেশিক সাহায্যের কথা আলোচনা কোরত। তার মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল বিদেশের সাহায্য ছাড়া অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয়। আইরিষ বিপ্লবীবা জার্ম্মানি থেকে অস্ত্র আর আমেরিকা প্রবাসী আইরিষদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেযেছে এই তথ্য তার মনে গভীব ভাবে দাগ কেটে দিযেছে। বিদেশে যাবাব উদ্দেশ্যেই সে বাংলাব সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। উপস্থিত হ'ল দিল্লীতে। আফগান দূতাবাসের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় সে ব্রতী হল। এই অবস্থায সে ধৃত হয়। পুলিশ বিচারের জন্ত তাকে নিয়ে এল লাক্ষ্ণৌ জেলে।

লাক্ষ্ণৌ জেলার পুলিশ সাহেব ছিলেন মুসলমান। একদিন তিনি

নির্জনে সাক্ষাত কোরলেন আস্‌ফাকের সাথে। বোললেন—আমিও মুসলমান। কেন তুমি হিন্দু রামপ্রসাদের তাঁবেদারী কোরে নিজের জীবন নষ্ট কোরছো? রামপ্রসাদের দল ইংরাজের রাজত্ব ধ্বংস কোরতে চায় হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তুমি কেন তার পিছে পিছে ঘোরো? সর্বদাই মনে রেখ—সে কাফের—সে হিন্দু।”

আসফাক ঈষৎ হেসে বোলল—ভুল বুঝেছেন খাঁ সাহেব—ভুল বুঝেছেন আপনি। রামপ্রসাদ হিন্দু নয—হিন্দুস্থানী। তারা চায়না হিন্দুর স্বাধীনতা—চায় হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা। আপনি তো মুসলমান। আপনি কি জানেন না ইসলাম পরাধীনতা স্বীকার করেনা। যে করে,—সে মুসলমান নয়,—কাফের—বেইমান। আমি সাচ্চা মুসলমান। তাই চাই ইংরাজ রাজত্বের অবসান। ফলে যদি হয় হিন্দু-রাজ, হিন্দুস্থানীর রাজ কায়েম না হয়—তখন আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তারও বিরুদ্ধে লড়বো।”

ব্যর্থ হোয়ে খাঁ সাহেব ফিরে গেলেন।

বিচারে আস্‌ফাকের ফাঁসির হুকুম হল। ফৈজাবাদ জেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে সে। নামাজ, রোজা, আর কোরাণ পাঠে দিন কাটায়। তার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে আসে কিন্তু মুখমণ্ডলে দেখা দেয় গাঢ় প্রশান্তি—অনির্বচনীয় জ্যোতি। তার সাথে দেখা কোরতে এক জন আত্মীয় এসেছেন। আসফাকের শীর্ণ দেহ দেখেই তাঁর চক্ষু সজল হোয়ে এল। আসফাক সান্ত্বনার স্বরে বোলল—ভেবেছেন আমি মরতে ভয় পেয়েছি,—তাই শুকিয়ে যাচ্ছি। সেটা ঠিক নয়। কয়েকদিন পরেই আমি যাব পরম পবিত্র খোদাতালার কাছে। ময়লা মাটী মনে নিয়ে তাঁর কাছে তো যাবার উপায় নাই। তাই রোজা আর নামাজে দিন কাটাই। বেশী খেলে খোদার ধ্যানে বাধা জন্মে। মোলাকাৎ অন্তে চোখ মুছতে মুছতে আত্মীয়টী ফিরে গেলেন ঘরে।

আসফাক্ ছিল কবি—ভাবুক। মৃত্যুর মোহনীয় বেশ সে চোখ ভরে দেখে নিয়েছিল। উর্দুতে সে একটী কবিতা লিখেছিল মৃত্যুর আগে' তার অর্থ—

জন্ম হইলে মৃত্যুও ঠিক আছে,—
প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মে ভয় কি কখনও সাজে?
এই দুনিয়ার রয়না তো কিছু
সব ধায় খোদা পানে—
ফৈজাবাদ ছাড়িয়া চলেছি
আমিও তাঁহারি টানে।

ফাঁসির আগের দিন আস্ফাক বেশ ভাল করে স্নান সেরে সজে গুজে এক বন্ধুর সাথে দেখা কোরল। তাকে হেসে বোলল—"কাল আমার বিয়ে।" হাসিমুখেই ফিরে এল নির্জন কক্ষে। সারারাত নামাজ আর কোরাণ পাঠ করে কাটিয়ে দিল সে। অতি প্রত্যূষে নীত হল বধ্য ভূমিতে। ধীরে ধীরে আরোহন কোরল ফাঁসিরমঞ্চে। তারপর স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বোলল সে—ভাই সব! আমি আজ খোদার পাশে যাচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু বিদেশীরাজের বিদেশী বিচারক রায় দিয়েছেন, আমরা দস্যু—আমরা নরহন্তা। আজ জিজ্ঞাসা করি জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নর-নারীকে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হোয়েছে তখন এই সব বিচারক কোথায় ছিলেন? তাঁদের বিচারে কি ভারতবাসীকে হত্যা, হত্যা নয়? হিন্দু মুসলমান ভাই সব ওঠো। জাগো! বোঝো! হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও। আজ বিচারক, পুলিশ কারো প্রতিই আমার মনে বিদ্বেষ নাই। বরং তাদের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি উছলে পোড়ছে। শুধু এই জন্যে যে তাঁরা আমাকে দেশের জন্যে মরার সুযোগ দিয়েছেন। উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকার প্রায়শ্চিত্ত

এ দেশের হিন্দু ভাইরা প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কোরেছেন। নন্দকুমার, নানা-সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাই, কুমার সিং থেকে সুরু করে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল, আমীরচাঁদ, আউধ বিহারী, বসন্ত, বালমুকুন্দ, কর্তার সিং আরও শত শত হিন্দু ভাই পূর্বপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত কোরেছেন নিজেদের প্রাণ দিয়ে। কিন্তু মিরজাফর, মীরন, ইয়ারলতিফ আরও শত শত মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত? ভারতের মুসলমানরা এই প্রায়শ্চিত্ত করেননি দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। তাই আমি কোরছি এই প্রায়শ্চিত্ত। বন্দেমাতরম্—আল্লাহো আকবর! ভাই রামপ্রসাদ! তোমাকে আমি এগিয়ে যেতে দেবনা—ভারতের মুসলমান পিছিয়ে থাকবেনা—মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে আমি কোচ্ছি এই প্রায়শ্চিত্ত।

তারপর ফাঁসির রজ্জুতে স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর—শুধু কারাগারের প্রাচীরে প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল অশরীরী বাণী—প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত।

সিঁড়ি

১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে ফরিদপুর শহরে একটা যুবক এসে হাজির হল। নাম তার সুবোধ রায়,—অন্ততঃ সকলে তাকে সেই নামেই জানত। যুবকটী বড্ড গরীব—লেখাপড়া বিশেষ হয়নি। তাই শ্রীরমেশ দাসগুপ্তের তাঁতের কারখানাতে ভর্তি হয়েছে তাঁত বোনা শিখতে সারাদিন সকলের ফরমাইস্ খাটে, আর ঠক ঠকি চালায় 'খট খট্'। কারখানায় যিনি কাপড় বোনানো শেখান তিনি দেখলেন ছেলেটী বুনতেও জানে না—শেখারও আগ্রহ নাই। সুতরাং সে যতটা ধমক ও গাল খেত ততটা খেতে পেত না। অপমানে, লাঞ্ছনায় অতিষ্ট হয়ে

ছেলেটী যেন কোথায় চলে গেল। কয়েকদিন তার পাত্তাই পাওয়া গেল না।

অবশেষে পাত্তা সে নিজেই দিল। একতাড়া ছাপা ক্যাশমেমো নিয়ে সে কারখানায় একদিন এসে হাজির হল। কারখানার ম্যানেজার মনীন্দ্র বাবুর কাছে গিয়ে বলল—"নিন আপনাদের ক্যাশমেমো—এইবার বিলের টাকাটা দিয়ে দিন্।"

তার কাছেই সকলে জানল যে সে ছাপাখানায় চাক্‌রী পেয়েছে। সকাল বেলায় মালিকের দুটি ছেলে মেয়েকে পড়ায়,—দুপুরে ছাপাখানার কাজ করে। বেতন কুড়ি টাকা,—তবে মালিকের বাড়ীতেই খায়। গরীব মানুষ,—বড় জোর বরাতেই চাক্‌রীটা মিলে গিয়েছে।

সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছেলেটার পাত্তা পাওয়া যায় না,—ভব ঘুরের মত ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। কোন কোন দিন রাত এগারটা পর্যন্ত বাইরে থাকে—হয়তো খাওয়াই হয়না। কারণ বাড়ীতে সকলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে প্রভাতে তার উপোসী খালি পেট ভরে বকুনিতে। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও বাড়ীর কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে। ছাপাখানার কেহ কেহ রহস্য করে বলেও সে কথা তার সম্মুখে,—সে শুধু হাসে। কোন উত্তর দেয়না।

ছাপাখানার বাবুর এক ছেলে প্রুফ্ দেখত। কি যেন কাজে তিনি কলকাতায় গিয়েছেন, ৭।৮ দিন পরে ফিরবেন। ঠিক সেই সময় চট্টগ্রামের এক স্কুলের প্রশ্নপত্র এসে হাজির। দশদিনের মধ্যেই দিতে হবে। পালি'র প্রশ্নপত্রও আছে এর মধ্যে। প্রেসের মালিক মজুমদার মহাশয়ের মাথা ঘুরে গেল। সুবোধকে ডেকে তিনি বললেন—"বড়ই মুস্কিলে পড়া গেছে। তুমি যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারতে খুব ভাল হত। ইংরাজী কিছুটা জানতো তুমি?"

সুবোধ বললে—"ভাল জানিনে। তবে দিন্—চেষ্টা করে দেখি।"

সুবোধের প্রুফ্ করেক্শন দেখে প্রেসের ম্যানেজার চমৎকৃত হল। একেবারে নিখুঁত,—মায় স্পেস্ দেওয়া পর্যন্ত। খুব খুশী হয়ে সে মালিককে দেখাল। বলল—"এমন সুন্দর করেক্শন ছোটবাবুর হাতেও হয় না।"

মজুমদার মশায় খুশী হলেন। কিন্তু সাথে সাথেই সুবোধের কাজ বেড়ে গেল। অবশ্য বেতনও কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা হল।

কয়েকদিন পরে মজুমদার-প্রেস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পদ্য সুবোধ দিল মজুমদার মশায়ের হাতে। পদ্যটা "আগমনী"। তাতে উত্তর বঙ্গের বন্যার কথা ছিল,—আর ছিল অবিচারে আটক রাখার কথা। পদ্যটীর কয়েক লাইন এইরূপ-

মাগো! রিক্ততার তিক্ততার সনে ক্লান্তিহীন করিয়া সমর,
জীবনের দীপ ভাতিহীন, সমাচ্ছন্ন ব্যথায় অন্তর।
পলে পলে, দিনে দিনে, বর্ষব্যাপী ডাকি তাই তোরে-
এস মাগো আনন্দরূপিনি! বর্ষ পরে শরতের ভোরে।
ভুলে যাই দুঃখ, অপমান, অদৃষ্টের নিয়ত আঘাত,
আসিতেছে স্নেহময়ী মাতা ঘোষে যবে শরৎ প্রভাত।
হাসি, গাই. নাচি সবে আত্মহারা পুলকে বিহ্বল.
জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনী! ভক্তি-অর্ঘ্যে তুলি উচ্চরোল
কিন্তু আজি উত্তর বঙ্গেতে উঠে ঐ দীন আর্তনাদ,
জননী কি সন্তানের তরে আনিয়াছে দুর্ভাগ্য, প্রমাদ?

তাতে আরও ছিল—

আরো যারা তোমারি সন্তান নির্বিচারে গেল কারাগারে,
এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজল আনিবি কি তাহাদেরও তরে?

মজুমদার মশাই বললেন—"একদম বাজে কবিতা। ও আমার কাগজে চলবে না। আমি নীলাম ইস্তাহার ছাপি, বেশ দু'পয়সা পাই

তা'তে সরকার থেকে। এই সব বাজে কবিতার জন্যে সেই আযটা নষ্ট করতে পারি না।"

সুবোধ ক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু কাগজ যখন বের হ'ল তখন দেখে বিস্মিত হ'ল যে কবিতাটী ছাপানো হযেছে সুবোধকে ডেকে মজুমদার মশায বললেন—"কাগজের ভার তমিই নাও তোমার বেতন পঞ্চাশ টাকা করে দেওযা গেল।"

এরই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সকলের সাথে খেযে দেযে সুবোধ নিজের ঘরে শুযেছে। কিন্তু কি একটা কাজে রাত এগারটার সময় ডাকতে গিযে দেখা গেল সুবোধ ঘরে নাই। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। দুর্যোগের রাত্রিতে সে ঘরে থাকবেনা এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। মজুমদার মশাযের ধারণা হ'ল ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে। তিনি ঠিক করলেন তাড়িযে দেবেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে খোঁজ নিযে জানলেন সুবোধের প্রবল জ্বর এবং সে আবোল তাবোল বকছে। মজুমদার মশায তার দোরের পাশে দাঁড়িযে শুনলেন সুবোধ বলছে—"নরেনদা। কেমন মজা। ক্ষিদের জ্বালায জাম খেতে হ'ল? আমি খাই—জামরুল। ওঃ জানেন না বুঝি আমার জন্য মাত্র পনর টাকা রেখে সব টাকা পাঠিযে দিই বরিশালের কাজ চালানোর জন্যে। যদি মরি? দুঃখ নাই—দুঃখ নাই—

"Blessed are those who shall live
The days of thy glory to see –
But the next dearest blessing on eart
Is the pride of thus dying for thee"—

মজুমদার মশায এবারে নিশ্চিত বুঝলেন ছেলেটী বিপ্লবী,—আর বেশ শিক্ষিত। শঙ্কিত হলেন তিনি। একে সত্বরেই বিদেয করতে হবে। তবে দুশ্চরিত্র বলে নয়, বিপ্লবী বলে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না। জ্বরের বেগ কমে এলে প্রেস-ম্যানেজার সুবোধকে বলল—"আপনি জ্বরের মধ্যে বার বার "নরেনদা" "নরেনদা" কোরছিলেন। কে তিনি ?

"কৈ—কিছু মনে হচ্ছেনা তো।" সুবোধ বললে। কিন্তু সেদিন রাতের পরে আর কেউ সুবোধ বাবুকে ফরিদপুরে দেখতে পায়নি।

সুবোধ ফরিদপুর থেকে রাতারাতি কোলকাতায় পাড়ি দিল। সেখানে গিয়ে রমেশদা, (আচার্য্য) আর কেদারদা'র সাথে দেখা করল সে। রমেশদা বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" দণ্ডের স্থলে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্ত হয়েছেন। আর কেদারদা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর রাজবন্দী হন। সকলের সাথে মুক্ত হয়েছেন। রমেশদা'র সাথে দুইদিন ঘুরেই সুবোধের ধারণা হ'ল পায়ে তাঁর ক্ষুর বাঁধা আছে। শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর, বালিগঞ্জ অবলীলাক্রমে অনবরত হেঁটে মেরে দিচ্ছেন তাও আবার হাঁটা নয় রীতিমত দৌড়। জনবহুল ফুটপাথে ও পথে প্রায়ই ঠোকা-ঠুকি হয় এর ওর সাথে। রমেশদা সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাত তুলে নমস্কার করেন আর বলেন—"পী-পী-পী-প্লীজ এক্সিউজ।" তাড়াতাড়িতে তোৎলামি বেড়ে যায় তাঁর। কিন্তু ঠোকা-ঠুকির পর নমস্কার আর ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আপনা হতেই এসে যায়। সুবোধ বলে—"রমেশদা! এঞ্জিন্ তো জোর চালিয়েছেন কিন্তু রীতিমত ফুয়েল না যোগালে বিগড়ে যাবে"

রমেশদা হেসে বলেন—"মনে নাই—ছ-ছ-ছড্ অব্ সন্ন্যাসিন্—

"দৈব বশে তুমি যাহা কিছু পাও—
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও'।"

সুবোধ হেসে বলে—"আরও দুটী ছত্র ছিল স্বামীজীর অরিজিন্যাল কপিতে,—প্রেসের দোষে ছাপা হয়নি। তা' হচ্ছে—

"পদ সঞ্চালন করিবেনা কভু—
আঁখি মুদি ধ্যান কর সদা বিভু।"

"এই ফাজিল" বলে রমেশদা তার পিঠে কীল মারলেন।

বৌবাজার ষ্ট্রীটের একটি বাসায় আড্ডা। সারাদিন কারও পাত্তা পাওয়া যায় না। কে কোন কাজে বাইরে যায় ঠিক নাই কিন্তু মাঝ রাতে বড় বড় ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আকার ধারণ করে ঘরগুলি। যে যেদিকে সুবিধে পেয়েছে, শুয়ে পড়েছে। একদিন রাতে তো এক বিষম কাণ্ড ঘটে গেল। একটা গোঙডানির শব্দে রমেশদা, সুবোধ আরও দু'এক জনের ঘুম ভেঙ্গে গেল আঁধার ঘরে ব্যাপারটা ঠিক বুঝা গেলনা। রমেশদা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে সুইচের সন্ধান করে আলো জ্বাললেন। তখন দেখা গেল পালংএর বিশালকায় রাইহরণ সেনের স্তম্ভাকৃতি পদযুগ অস্থিসর্বস্ব ক্ষীণকায় কেদারদা'র বুক ও পেটের উপর বিরাজ কর্চ্ছে— কেদারদা'র নড়া-চড়া নাই- শুধু গোঁ গোঁ কচ্ছে'ন। সুবোধ হা-হা করে হেসে উঠল। রমেশদা বললেন—"ক্ষী-ক্ষীণকায় বসুদেবের বুক থেকে আগে পাথর নামাও—তারপর হেসো।"

ব্যাপারটা হাসির হলেও গুরুতর। রাইহরণ বাবুর পা' দুটো ধরে টানতে গেলে যদি তিনি ঘুমের ঘোরে পা' ছুড়েন তা'হলে বেচারী কেদারদা'র ভবলীলা সাঙ্গ হবে এবং Rescue Partyর দু'চারজন ছিটকে পড়বে অপর দশজনের মুখ, বুক, পেট, পা, পাশ বা পিঠ থেঁতো করে। সময়ও নষ্ট করা চলেনা ক্ষীণ-প্রাণ কেদারদা'র প্রাণের পক্ষে প্রতি মিনিট মূল্যবান। সুতরাং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করতে হবে,— কিন্তু একটা definite plan নিয়ে। সুবোধ বললে—"আমি মেকানিক্-সের ছাত্র ছিলাম,—পুলী সিস্টেম জানি কিছু কিছু : আমিই ব্যবস্থা কচ্ছি।"

এই বলে সে রাইহরণ বাবুর দুই পায়ে একখানি ধুতির দুই মুড়ো বেঁধে জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ধুতির মধ্যাংশ বের করে দিল।

দু'জনকে বলল—"আপনারা দু'খানা পাখা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন—আর আমি ওয়ান্, টু, থ্রি বলার সাথে সাথেই দুপাশ থেকে 'প্রাণহরণ' বাবু'ক আক্রমণ করবেন। আমি আর রমেশদা এক সাথে দড়িতে লাগাব টান্।"

তাই করা হলো। আচমকা টানে রাইহরণ বাবুর পা দু'টো উঠে পল শূন্যে আর পাখার ডাঁটের গুঁতো খেয়ে তিনি জেগে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর পা দু'টো অনেকটা শূন্যে উঠে গেছে। তিনি ব্যর্থকাম হয়ে তর্জন গর্জন সুরু করে দিলেন। তাঁর হুঙ্কারে ঘরের সকলেই জেগে উঠল। ব্যাপার দেখে একটা বিরাট হাসির ধূম পড়ে গেল। কেদারদা উঠে বললেন—"আপনাগো ছেলেমান্‌ষি এখনও যায় নাই।"

"হা হতোস্মি' বলে সুবোধ ঘরে ঢুকে পড়ে বসে পল বলল—"দেখলেন তো রমেশদা! একেই বলে 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।' এই ছেলেমানুষি না করলে যে এতক্ষণ ওঁর দেহ যেত Post Mortem Examination-এর জন্যে, আর আমাদের সকলকে হয় সাক্ষী নয় আসামী হতে হত সে খেয়ালই নাই কেদারদা'র। এই জন্যেই শাস্ত্রে আছে 'দো-পেয়ের হিত করোনা'।"

সে রাত্রি আর কারো ঘুম হলোনা। পরদিন সুবোধ কেদারদা'কে বলল—"কেদারদা! আপনি একটু চেঞ্জে যেতে পারেন? এই শরীর,—"

বাধা দিয়ে কেদারদা বললেন—"শরীর খারাপ কি দেখলে?"

সুবোধ হেসে উত্তর দিল—"নাঃ—তেমন আর খারাপ কি। তবে ভয় হয় কবে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আপনাকে না জানি কলেজে বয়ে নিয়ে যায়। আর তাদের পৃথক পৃথক অঙ্গের হাড় কেনা দরকার হবেনা। এক সাথে গোটা স্কেলিটন্ পাবে কিনা!"

কেদারদা বললেন—"চেঞ্জে তো যাবো! কিন্তু টাকা—টাকা কৈ?"

"কেন? আপনি তো শুনেছি তুলোর কণ্ট্রাক্ট ব্যবসায়ে মাসে প্রায় হাজার টাকা উপায় করেন।"

"আরে সেই টাকাই আজ পার্টির বড় সম্বল। আমি তা নিজের জন্য ব্যয় করি আর তোমরা পুনরায় ডাকাতি সুরু কর,—না? মনটা বুঝি খুব উস্ খুস্ কচ্ছে?

"তা' একরকম মন্দ ছিল না। এ নিরামিষ আয়োজন ভাল লাগেনা। এই জন্যেই তো ছেলে মহলে বিদ্রোহের ভাব জমাট বাঁধছে।" সুবোধ বললে।

কেদারদা সুবোধের দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটা ছত্র—

"হায় সে কি সুখ এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।
"থাক্ ভাই থাক্, কেন এ স্বপন—এখনো সময় নয়,
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে, পূর্ব গগনে হেরিতে অরুণোদয়।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—"আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে সেনাপতি ওয়াসিংটন সৈন্যসামন্ত নিয়ে ক্রমশঃই যুদ্ধ এড়িয়ে হটে আসছেন! সহকারী সেনাপতি জেনারেল ওয়ার্ড দুঃখে ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে "সেনাপতি! কাপুরুষের মত আর কতকাল আমরা এভাবে পালাব?" ওয়াসিংটন স্মিতহাস্যে উত্তর করলেন—"I shall retreat and retreat till I understand that my army is prepared to give a fight to the enemy." আমরা যদি অতীতের ব্যর্থতার অনুকরণ করে যাই, আমাদের ব্যর্থই হতে হবে। তাই মহাত্মার আন্দোলনকে আমরা জনতার বৈপ্লবিক প্রস্তুতিতে নিয়োগ করতে

চেয়েছি নীরবে আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, যে সব ঘাঁটি অচল করলে সরকার অচল হবে সেগুলো আমাদের নীরবেই দখল করতে হবে,—ক্ষণিক উত্তেজনায় বেফাঁস গবম কিছু করে ফেললে,—সব আয়োজন পণ্ড হবে, অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হবে।"

এই কঙ্কালসার লোকটীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সুবোধের মনে। যাব "শরীবং ব্যাধি মন্দিরং"—তাও আবার যে সে ব্যাধি নয়, একেবারে ব্যাধিনাম্ শিরোভূষণ যক্ষ্মা,—তার মগজ এত ঠাণ্ডা কেমন করে থাকতে পারে, এত গভীব চিন্তা কবার শক্তি তার আসে কোথা থেকে,—ভেবেই পায়না সুবোধ। এঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয় কি জয় করেছে ব্যাধির যন্ত্রণা?

ঢাকা থেকে পূর্ণানন্দ এসে হাজিব হয়েছে। সকলে ডাকে তাকে আনন্দ বলে। আনন্দ তো আনন্দই। দিন বাত মুখে হাসি লেগেই আছে। সুবোধের সাথে ঢাকাতেই পারচয় হয়েছিল তাব। তাকে দেখেই বলল—"ফরিদপুরবে শ্যায কইবা আইছাও এখানে? অ রমেশদা, অ কেদাবদা তারাইয়া গ্যান —তারাইয়া গ্যান্ ইডারে।" তারপরই একগাল হাসি—হে-হে-হে-হে—

সুবোধ বলল—"কোত্থেকে পাগলাচণ্ডী এসে হাজির হল এখানে? জানিস্ এটা কেদারাশ্রম,—উন্মাদাশ্রম না? পাগলামি করলে তাড়িয়ে দেব।"

সন্ধ্যার পর সুবোধ সাড়ম্বরে কেদার-উদ্ধার কাহিনী আনন্দকে শুনালো। হাস্তে হাস্তে আনন্দ বলল—"তুই তো খুব পুলী সিস্টেম ফলাইছস্! আজ হইতে তোরে ডাবুম্ 'মেকানিক' নামে।

সেদিন রাতেও আর এক বিভ্রাট ঘটে গেল।

দুপুর রাতে আনন্দ এসে সুবোধকে ডাকছে—"এই মেকানিক্, ওঠ্—ওঠ্।"

"যাঃ—বিরক্ত করিসনে" বলে সুবোধ পাশ ফিরে শুলো।

"ওঠ—ওঠ—পুলিশ—পুলিশ"—আনন্দ আবার ধাক্কা দিল। সুবোধ উঠে বসতেই, আনন্দ বলল—"ভারী বিপদে পড়ছি। ক্ষিতীশদা'র (ব্যানার্জি) পাশে শুইছি। এমন নাসিকা গর্জন কোরত্যাছেন তিনি—যে আমি একদম ঘুমাতে পারি নাই। তুই তো ভাই মস্ত মেকানিক। কেদারদারে বাঁচাইছস—এবারে বাঁচা আমারে।"

সুবোধ খানিকক্ষণ ভেবে নিল। চিন্তিতভাবে বলল—"নাসিকা গর্জন" অর্থাৎ Nasal Roar—তাই কিনা? আচ্ছা দেখি।" ঘরের কোণে ষ্টোভটা ছিল। সুবোধ তা থেকে "Silencer"টা নিয়ে যথাসম্ভব দূর থেকে হাত বাড়িয়ে ক্ষিতীশদা'র গভীর গর্জনরত নাসিকার উপর স্থাপন করতেই তিনি তড়াক্ করে উঠে বসলেন। Silencerটি ঝন্‌ঝনিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু গর্জন গেল থেমে।

সাফল্যের গর্বে বুক ফুলিয়ে সুবোধ আনন্দকে বলল—"দেখলি? দেখলিরে বেকুব। কেমন immediate effect! স্টোভের roaring থেমে যায় silencer দিলে, আর নাকের roaring থামবে না!"

ক্ষিতীশদা এবার ব্যাপার বুঝে সকলের সাথে হাসিতে যোগ দিলেন।

পাঁচ ছয় দিন পরে আনন্দের সাথে সুবোধ চলে এল ঢাকায়। সেখানে যেয়েই সে বুঝতে পারল কেন কেদারদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। নরেনদা আর প্রতুলদা (গাঙ্গুলী) তাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন জনতার কোলাহলের অন্তরালে কিভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলেছে। প্রতুলদার সাথে একটি বাসায় গিয়ে সে দেখল পাঁচ ছয়জন যুবক একজন লোকের তত্ত্বাবধানে বোমা তৈরী কোরছে। তত্ত্বাবধায়ককে দেখিয়ে প্রতুলদা বললেন—"বিদেশ থেকে এসেছেন। খুব Expert. আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে পরবর্তী গণ-আন্দোলনকে আমরা বৈপ্লবিক রূপ দিতে পারি।"

সুবোধ টের পেল বিখ্যাত বিপ্লবী অবনী মুখার্জি রুশ দেশ থেকে

এসে লুকিয়ে আছেন ঢাকায়। আনন্দের সাথে এক বাসায় গিয়ে সুবোধ দেখল সেখানে মহারাজ আছেন—আর আছেন অতি পরিচিত পুরাতন বন্ধু দাস্থদা (প্রবোধ দাসগুপ্ত) এবং শচীন চক্রবর্তী। মহারাজ ওঁদের নিয়ে কারেন্সী কারখানা খুলে দিয়েছেন। দশ টাকা ও একশো টাকার নোট জাল হচ্ছে। মহারাজের পদধূলি নিয়ে সুবোধ হেসে বলল—"বেশ হয়েছে! ডাকাত হয়েছে জালিয়াৎ! Criminal instinct যাবে কোথা থেকে—তা যতই মহাত্মার মহাপবিত্র আন্দোলন হোক না কেন! আপনাদের Criminal Tribes' Actএ ফেলা উচিত।"

দাস্থদা বললেন—"সরকার তোমার Suggestionএর অপেক্ষা রাখেন নি। শুনেছো বিহারে রামবিনোদ, ধ্বজা, যোগেন্দ্র আরও কয়েকজনকে ঐ য়্যাক্টেই ফেলা হয়েছে। শান্তি ভাইয়া সেখানে থাকলে তার দশাও তাই হত.—সুবোধ রায় সেজে মাতব্বরি ফলানোর সুযোগ মিলত না।"

* * *

বাসায় অভাব অনটন লেগেই আছে। ছাপানো নোটগুলি প্রতিদিন নানাস্থানে চালান দেওয়া হয়। একদিন কলকাতা থেকে বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন সান্যাল মহাশয় এসে ইউ, পি-র জন্যে দুই তাড়া নিয়ে গেলেন। এত টাকা অথচ বসায় খরচের কিছু নাই। এ যেন "Water, water every where,—not a drop to drink." একদিন সুবোধ বললে—"মহারাজ, আজ তো কিছুই নাই খাবার। একখানা দশটাকার নোট দিননা—আজকের খরচটা চালাই।"

মহারাজ হেসে বোললেন—"বাজারে কোন গরীবকে ঠকিয়ে আমরা বাঁচতে চাইনে। আমাদের সব নোট চলে যায় বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে —বড় বড় গদীতে—বড় বড় transactionএ। আর একটা কথা জান তো? হুঁসিয়ার চোর ডাকাত নিজের গ্রামে চুরি ডাকাতি করেনা।

বাজার হবেনা, খেতে পাবেনা,—এই তো? তা যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরে, সেই দেশের সেবকরা যে সব দিনই খেতে পাবে, এমন কথা তো হতেই পারে না। ত্মাখো—যদি কারো কাছে দু' তিন আনা পয়সা পাও তাই দিয়ে ছাতু কিনে আন। বেশ পেট ভরবে।"

চৌদ্দ বছর পরে বিমান যদি ঢাকার বাসায় উপস্থিত থাকত—সে চমকে উঠতো গড়পাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার শশীবাবুর কথা—তাঁর স্বর শুনে। শশীবাবুই যে ভোল বদলে মহারাজ হয়েছেন, এ কথা সে চোখ বুজেও বলে দিতে পারতো।

* * *

কোলকাতার বুকের উপর পরপর কয়েকটা ডাকাতি উপলক্ষ করে প্রবীণ বিপ্লবীদের আশঙ্কিত বিপর্য্যয় দেখা দিল। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি ১৮১৮ সালের তিন আইনে এক ঝাঁক বিপ্লবী নায়কদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে! ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষবাবু (নেতাজী) শ্রীসত্যেন মিত্র, অধ্যাপক অনিলবরণ রায় প্রমুখ বাহাত্তর জন বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল।

নরেনদা (নরেন সেন) প্রতুলদা, রমেশদা, আশুদা, সুবোধ, ১৯২৩ সাল থেকেই ফেরারী। প্রতুলদা মাঝে মাঝে বামভাঁওতা জুড়ে দিয়েছেন। পুলিশ, গোয়েন্দা বাংলা দেশের সর্বত্র তাঁকে খোঁজ কোরছে। অথচ তিনি মাঝে মাঝেই স্বগৃহে সচ্ছন্দে অবস্থান পূর্বক নাসিকা বিবরে সর্ষপ তৈল দিয়া নিদ্রা যান। একজন পাকা বিপ্লবী ফেরারী যে নিজ বাড়ীতেই থাকতে পারে গোয়েন্দা প্রভুরা প্রথমতঃ ধারনায়ই আনতে পারেনি। কিন্তু সত্য স্বপ্রকাশ। আগুন থাকলেই ধোঁয়া থাকে। বোধ হয় একদিন এই ধোঁয়া দেখেই আগুনের অস্তিত্বের আবিষ্কার তারা করতে অগ্রসর হল! দুপুর বেলা! বেচারা প্রতুলদা খাওয়া দাওয়া সেরে পার্টীর একটা স্কীম তৈরী করছেন। এমন সময় র‍্যাডিশনাল

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ্যানসন সাহেব সদলবলে হানা দিলেন প্রতুলদার গৃহে। প্রতুলদা পুলিশদের অকস্মাৎ এইরূপ বুদ্ধি বিকাশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন তার খোকা চিরকালই ওদের বোকা বানিয়ে রাখবে। কিন্তু তা হলনা দেখে কিছুটা অপ্রতিভ হলেও তৎ-ক্ষণাৎ সপ্রতিভের মত স্কামটা বোনের হাতে দিয়ে ছাদের উপর দিয়ে দৌড় দিলেন। ততক্ষণে কয়েক জন সিপাই পাঁচীর টপকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে দোর খুলে দিয়েছে। হ্যানসন, বসন্ত মুখার্জি প্রভৃতি গোয়েন্দা কর্তারা দৌড়ে প্রবেশ করবেন এমন সময় প্রতুলদার মা আর বোন দুজনার জামা চেপে ধরে আর্তস্বরে অভিযোগ সুরু করলেন—সাহেব। বিচার করে যাও। বাড়ীতে বেটাছেলে নাই—সিপাই ঢুকেছে—তুমি বিচার করে যাও সাহেব ।।—সাহেব যতই বলে—ও মাদার। চোড়-চোড়। কিন্তু কে কার কথা শুনে। মাদাররা জামা টেনে আর বিচার মেনে হ্যানসন আর মুখার্জিকে না হ'ক পাঁচ মিনিট আটকে রাখলেন। ইত্যবসরে প্রতুলদা পাশের বাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পলেন। কিন্তু পা গেল তাঁর মচকে। প্রতুলদার বাসার দিকে পুলিশ যাচ্ছে খবর পেয়েই দলের সভ্য খোঁহাদার দাঙ্গাবাজ শ্যামপাণ্ডে আর শচীন ব্যানার্জি ছুটে গিয়েছে সেদিকে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুবোধ নাগ (রুমু)। তিন চার জনে মিলে আহত প্রতুলদাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হল।

প্রতুলদা কিন্তু বেশী দিন টিকতে পারলেন না। ত্রিপুরার শ্রীমনীন্দ্র চক্রবর্তীর সাথে ফরিদপুর হয়ে কোলকাতায় যাবার পথে রাজবাড়ী ষ্টেশনে তিনি ধরা পলেন। মনীন্দ্র বাবু দুঃসংবাদ বহন করে ঢাকায় এলেন। খবর শুনে সুবোধ খুবই ব্যথিত হল। মহারাজ তখন একমনে নোট ছাপা-চ্ছেন। এস্ত পদে সুবোধ তাঁর কাছে গিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল—মহারাজ। প্রতুলদা ধরা পড়েছেন, রাজবাড়ী। মনিবাবু ফিরে এসেছেন।

মহারাজ নিবিষ্টচিত্তে প্রেসে প্যাঁচ কষছিলেন। মাথাটাও তুললেন না। অন্যমনস্ক ভাবেই যেন বললেন—হুঁ—হয়েছে—তারপর।

এত বড় দুঃসংবাদে এত নির্লিপ্তভাব! সুবোধের মনে হল কথাটা মহারাজের বোধগম্য হয়নি। ইচ্ছা হল মহারাজকে একটী প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে বলে, মহারাজ! মহারাজ! প্রতুলদা গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই সুবোধের মনে হল মহারাজের অচঞ্চল সংযম তার অসংযত চাঞ্চল্যের গালে চড় লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে খসে পল সেখান থেকে; মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিষম লজ্জার বিষয় মনে হল তার কাছে।

পূর্ণানন্দ একদিন বিনা আলোর সন্ধ্যার পর সাইকেল চালানোর অপরাধে পাঁচ আইনে একরাত্রি কারাবাস করে এসে খুব হম্বি তম্বি লাগিয়েছিল সুবোধের উপর। "তোরা অপদার্থ,—দেশ সেবকের সম্মান দ্যাওন জানস্ না। এই যে আমি অনাহারী হাকিমরে বেকুব বানাইয়া তিন টাকা ফাইন না দিয়া একরাত জেল খাইটা আইলাম,—আর তোরা জেল গেটে ফুলের মালা, নিশান লইয়া গেলিনা.—বন্দেমাতরম—ভারত মাতাকি জয়,—পূর্ণানন্দকি জয় ধ্বনি দিলিনা কিয়ের লাইগা ক' তো? তোগো মনে কি একবিন্দু দেশ-প্রেমও নাই?" তারপরই স্বভাব-সিদ্ধ হে-হে-হে হে।

সুবোধ বলেছিল—"বেশী হাসিস্‌নে। জানিস্ আমাদের জ্বর ম্যালেরিয়া আর তোর হচ্ছে টাইফয়েড? আমাদের প্রথম ধাক্কাতেই ১০৫ ডিগ্রি। তারপর কমে কমে ছেড়ে যাবে। তোর হবে ঠিক উল্টো। ধীরে ধীরে বেড়ে পরে তোকে শেষ কোরবে।"

হ'লও তাই। এবার পূর্ণানন্দ ধরা পড়ে হিকস্ সাহেবের হাতে বেদম মা'র খেল। জেলে সুবোধের সাথে দেখা হলে বলল—"ব্যাটায় খুব পিটাইছে আমারে।"

১৯২৮ সালে সকলেই আবার মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এল। আবার সুরু হল বাহিরে হৈ চৈ আর ভিতরে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি।

সুবোধ এবার বিয়ে করে সংসারী হল। কিন্তু একবছর পরে আবার যেতে হল জেলে। বছর দুই পরে সে অন্তরীণের আদেশ নিয়ে ফিরে এল ঘরে। আশুদা তখনও ফেরারী। তিনি এসে তার সাথে দেখা করে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে গেলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনিও ধৃত হলেন।

এই থেকে সুরু হল সুবোধের অজ্ঞাত বাস। সাত বছর পরে রমেশদা, কেদারদা, আশুদা, রবিদা সকলেই ফিরে এলেন। এলোনা শুধু আনন্দ। পরপর দুইটি ষড়যন্ত্র মামলায় তার ডবল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়েছে। সে জেল খাটে আর ভাবে সুবোধ ঠিকই বলেছিল- লক্ষণ দেখেই চিনেছিল টাইফয়েড্ জ্বর।

জেল থেকে রমেশদা বেরিয়েছেন পঙ্গু হয়ে,—আর কেদারদা প্রায়ই শয্যাশায়ী।

দেশের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্টা চলে গিয়েছে। নোয়াখালী দাঙ্গার পর মহারাজ সেখানে চলে গিয়েছেন সেবার ভার নিয়ে। জহরলালের ইণ্টেরিম গভর্ণমেণ্ট পূর্ণনন্দদের ছেড়ে দিয়েছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিদ্রোহী ন্যাংটা ফকিরের শিষ্যদের কাছে খণ্ডিত ভারতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করল। কেউ হাসল- কেউ কাঁদল। তবে হাসির হল্লা ছাপিয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত, আকাশ, বাতাস কেঁপে উঠল আর্তের মর্মান্তিক রোদন ধ্বনিতে জগদ্ধাত্রী এল করালী চামুণ্ডার বেশে।

হঠাৎ রবিদা খবর পেলেন সুবোধ সপরিবারে এসেছে কলকাতায় গুরুতর পীড়িত হয়ে। রমেশদা, কেদারদা, মহারাজ, পূর্ণানন্দ সকলেই কলকাতায়। সদলবলে গেলেন তাঁরা সুবোধকে দেখতে। তালতলা

অঞ্চলে একটা এঁদো গলীতে একখানি খোলার ঘর। কড়া নাড়া দিতেই একটি ছোট্ট ছেলে এসে দোর খুলে দিল। ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখতে পেলেন মেঝের উপর মলিন বিছানায় একটি লোক শুয়ে আছে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, গায়ের রং যেন জ্বলে গিয়েছে, কোটরগত চক্ষুতে রক্তের লেশমাত্র নাই,—কাচের মত সচ্ছ তার শ্বেতাংশটুকু। মাথার কাছে অবগুণ্ঠিতা একটি নারী মাথায় বাতাস দিচ্ছিল,—সকলকে ঢুকতে দেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রোগীর ছিল তন্দ্রার ভাব। নিঃশব্দে থমকে দাঁড়াল সকলেই। ফিস্ ফিস্ করে মহারাজ বললেন—"এই কি সুবোধ?"

মাথা নেড়ে রবিদা জানালেন—"হ্যাঁ।"

নিঃশব্দে বসলেন তাঁরা সুবোধের দুই পাশে

হঠাৎ সুবোধের পেট ও বুক আন্দোলিত হল,—খক্ খক্ করে সে কাশতে লাগল। মুখে খানিকটা কাশি উঠতেই মহারাজ চূণভরা একটি মাটীর পাত্র ধরলেন মুখের কাছে। কাশি ফেলে সে একবার চেয়ে দেখল এপাশ ওপাশ। ইঙ্গিতে জানাল হাওয়া প্রয়োজন। পূর্ণানন্দ হাওয়া করতে লাগল। প্রায় দশ পনর মিনিট পর সে যেন কিছুটা সুস্থ হল। আবার সে এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখল। আস্তে আস্তে বলল "মহারাজ —রবিদা,—ওটা রমেশদা না? এত খারাপ হয়েছে আপনার চেহারা? আরে কেদারদা যে। আপনার শরীর আর খারাপ হবে কি! মরার বাড়া গাল নাই—আপনিতো মরেই রয়েছেন। এখন উঠতে হাঁটতে পারেন তো? আনন্দ—পুনাচোরা—তুইও এসেছিস্। বাঃ—বেশ চেহারা করেছিস্! আয় আমরা সবাই মিলে রবিদাকে হাউসসার্জেন আর মহারাজকে সিস্টার নার্স করে হাঁসপাতাল খুলে দি।" হাসি আর কাশি এক সাথেই এল সুবোধের। কাশি থামলে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন "এখন কেমন আছ?"

সুবোধের মুখে যেন ঈষৎ হাসি খেলে গেল। "কেমন আছি? আপনারা কেউ দাদার পত্র পড়েন নি। ১৯১৭ সালে চন্দন নগর থেকে ওটা বেরিয়েছিল। তাতে ছিল—

"দাদা! ঋণ তব নারিব শুধিতে এ জীবনে
গণিতেছি দিন তাই বরিতে মরণে।"

কিছুটা থেমে আবার বলল—"রবীন্দ্রনাথ কি কবিতাই লিখেছেন-যেন মর্মবীণায় বেজে উঠেছে বিদায়ের গান

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে,—বোধ হয় দু ফোঁটা অশ্রুও গড়াল তার চোখ থেকে

ঘরের বাতাসটাও যেন কাঁদন-ভরা ব্যথায় কেঁপে উঠল তারপর নীরবতা।

রবিদা জিজ্ঞেস করলেন—"কি অসুখ তোমার?"

আবার সেই ম্লান হাসি।

"আমার অসুখ? আমার অসুখ দৈন্য, দেহ আর মনের নিরত অসীম দ্বন্দ্ব,—আমার অসুখ অনাহার,—অন্তর-যোড়া ব্যর্থতার হাহাকার।" হাঁপাতে লাগল সুবোধ

পূর্ণানন্দ তাকে পাখা দিয়ে হাওয়া দিতে দিতে বলল—"আর বেশী কথা বলিসনে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে সুবোধ বলল—"কথা বলব না? বলিস কি তুই? আজ এঁদের সকলকেই পেয়েছি, হয়তো এই শেষ পাওয়া। আজ আমার বলতেই হবে সব কথা। এত দুঃখ, এত দৈন্য আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।" তারপর সে সুরু করল নিজের কাহিনী।

"কি জানি কোন দুর্বল মুহূর্তে বিয়ে করে বস্‌লেম। এর পরও সমিতির কাজ করেছি ত্রুটীহীন ভাবে,—জেলেও গিয়েছি—অন্তরীণেও থেকেছি। কিন্তু সর্বদাই মনে হত আমার বৈপ্লবিক আগ্রহে যেন ফাটল ধরেছে—আগেকার বিপ্লবী আমি আর নাই। জেল থেকে ফিরে এসে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। নিজে খেতে হবে,—স্ত্রী-কন্যাকে খাওয়াতে পরাতে হবে। বিত্তহীন,—নিঃস্ব আমি। তার উপর কোন ডিগ্রীর মূলধনও নাই। তাই অবস্থার চাপে এক জমিদারের চাকরী নিলেম। কিন্তু বিপ্লবী সুবোধ রায়ের এই দুর্দশা দেখে অন্তর আমার নিয়তই হাহাকার করত।"

আবার ক্ষণকাল নীরব থেকে সুবোধ যেন দম্ নিয়ে নিল। পুনরায় সে সুরু করল কাহিনী।

"ক্রমে এই মানসিক দ্বন্দ্ব অসহ্য হয়ে উঠল একজন বন্ধুর চেষ্টায় এবারে ঢুকে পলাম এক সওদাগরী অফিসে। দুঃখে কষ্টে, টেনে-টুনে দিন চলতে লাগল। কিন্তু দশ মাস আগে সে অফিস দোর বন্ধ করেছে। সেই থেকে দৈন্য, অভাব, অনশন আমার নিয়ত সঙ্গী। আমার না হয় অভ্যাস আছে,—ফেরারী অবস্থায় কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি,—জেলে কতবার অনশন ধর্মঘট করেছি কিন্তু এরা? আমার ছেলে মেয়েরা আমারই সামনে অনাহারে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেছে, আর ওদের মা,—কোনদিন কিছু চায়নি আমার কাছে, ছেলে মেয়ের এই অবস্থা দেখে, আমার অবস্থা দেখে কেবলই খেটেছে আর নীরবে কেঁদেই চলেছে। চোখের উপর এই সব দেখে অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে আত্মহত্যা করি। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া,—তিনি আমাকে সে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন। সাধে কি লোকে বলে ঈশ্বরের অপার করুণা।"

পুনরায় একটু থেমে সুবোধ বলল—

ব্যাধিরূপ করুণা তোমার, নিয়ে যাবে মোরে
শান্তির পারাবারে,
"প্রেয়সীর অশ্রুজল, মমতার আকর্ষণ'-
পড়ে রবে পশ্চাতে আমার, নাহি চাব ফিরে।"

কেদারদা বললেন—"তোমার তো সাহিত্য প্রতিভা ছিল। কোন দৈনিক বা সাময়িক পত্রিকাতে একটা চাকরী যোগাড় করে নিতে পারলে না?"

"হুঃ—আমার আবার সাহিত্য প্রতিভা! অনেক চেষ্টা করেছি,—কিন্তু সকলেই চায় ডিগ্রি। হয়তো কিছু কিস্মত থাকলে ওর মধ্যেই স্থান হয়ে যেত। পেটের দায়ে অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখে পাঠিয়েছি কলকাতার কাগজে। কিন্তু তা হয়তো ছাপানোর যোগ্য হয়নি,—তাই ওঠেনি। যাকগে, একটা কথা আজ আপনাদের বলব। দৈন্যের এই পেষণের তলেও কেন যেন মনে হয় বিপ্লবী সুবোধ রায় মরেনি। যদি দুটো পেট ভরে খেতে পেতাম, যদি আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়েরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে খেতে পরতে পেত ত' হলে আমি এই বয়সেও পাহাড় প্রমাণ কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে দৃঢ়পদে পথ চলতে পারতেম। কিন্তু সব ব্যর্থ হল দৈন্য অভাবে।

সুবোধের গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করতে লাগল। মনে হ'ল সে অশ্রু রোধ করছে। একটু পরে সে জড়িত কণ্ঠে বলল—"মহারাজ! আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। সে আঘাত আমাকে মরণের পরপারেও ব্যথা দিবে। আমি কখনও আমার সেবার প্রতিদানে কিছু চাইনি—সর্বদাই মনে রেখেছি—

আমার আদর্শ ছিল নিষ্কাম দধীচি,
যেই ঋষি হাসি মুখে সমর্পিল অস্থি আপনার—
দেব-রাজ্য উদ্ধারের লাগি।"

রমেশদা বারে বারে বলতেন— তোমার দেব-রাজ্যতো উদ্ধার হয়েছে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করেছে। ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারত স্বাধীন পাণ্ডিত জহরলাল এখন স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, সর্দার প্যাটেল ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ— আর আমাদের ভূপতি মজুমদারও একজন মন্ত্রী ”

সহসা সুবোধের সর্বশরীর কেঁপে উঠল—প্রাণপণে সে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যর্থ হয়ে নরুপায় ভাবে যথাসাধ্য চীৎকার করে উঠল— “মতি, মতি অনু—খুকু খোকা—দীপু তোরা সব ছুটে আয়। ভারত স্বাধীন হয়েছে,—সকলে চীৎকার করে বল বন্দেমাতরম আজ চার দিন হল এসেছি পাড়াগাঁয়ে, আমি এর কিছুই জানিনা। কৈ তোমরা সব নীরব রইলে কেন? ভারত স্বাধীন। ভারত স্বাধীন। ও কি মতি তুমি কাঁদছো কেন? আর কোন দুঃখ নাই এবারে তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে খেতে পরতে পাবে, ছেলেদের শিক্ষা হবে—আমার চিকিৎসা হবে—আর আমি মরবনা। আমি দেশের সেবা করেছি বলে নয় এতো স্বাধীন ভারতের আদর্শ। এই আদর্শের জন্যই মহাত্মাজী লড়াই করেছেন আদর্শবাদী নেহেরুজী জেল খেটেছেন। তার উপর আমাদের বিপ্লবী বন্ধু ভূপতি বাবু রয়েছেন। আর কি আদর্শের অমর্যাদা হতে পারে,—প্রত্যেক ভারতবাসী এবার মুক্তির অমৃতে অমর হবে”

বাধা দিয়ে বড় মেয়ে অনু বললে—“থামো বাবা। থামো তোমার ব্যামো বেড়ে যাবে। যারা স্বাধীনতা পেয়েছে তারা পেয়েছে। তুমি আমি যে তিমিরে—সেই তিমিরে। এ তো তুমি দেশের জন্য এত ত্যাগ করেছো। কিন্তু স্বাধীনতার পর তোমার স্থান কোথায়?

উত্তেজিত ভাবে সুবোধ জবাব দিল ‘পদতলে ওরে বোকা মেয়ে। দেখিসনি তুই সিঁড়ির বুকে পা দিয়ে সকলে উঁচুতে ওঠে কিন্তু সিঁড়ির প্রয়োজন তাতে ফুরোয় না। আমরা হচ্ছি সেই সিঁড়ি

প্রফুল্লচাকী, ক্ষুদিরাম, থেকে সুরু করে তারিণী, নলিনী, গোপীনাথ, সূর্য্যসেন, কণকলতা, মাতঙ্গিনী মোহিনী, রামেশ্বর পর্যন্ত যারা প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্যে, কারাগারে, অন্তরীণে, নির্বাসনে যারা জীবন যৌবন খুইয়েছে, যারা নাম যশের কামনা না রেখে অজানার অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশ-মুক্তির তপস্যা করেছে—এই মহারাজ, রবিদা, রমেশদা, কেদারদা পূর্ণানন্দ সকলে মিলে রচনা করেছেন সেই সিড়ি,—পদাঘাতে পদাঘাতে ক্ষয়ে যাওয়ায় আজ চেনা না গেলেও আমরা সেই সিড়ি। আমাদের বুকে পা রেখে অপরে উঁচুতে উঠলেও আমাদের ক্ষোভ নাই, প্রতিবাদ নাই, চাওয়ারও কিছুই নাই। কিন্তু এই সব আমাদের চিরকাল থাকবে যে ভারতের তরুণ দলের শোণিত আর অস্থি দিয়ে নির্মিত হয়েছে এই সিড়ি। তাদের অন্তরের নিষ্কাম গেরুয়া রং রাঙ্গিয়ে তুলেছে এই সিঁড়ি।

উত্তেজনায় সুবোধ হাঁপিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই কাশি। থর থর কেঁপে উঠল তার সর্বদেহ—এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে বের হয়ে—গণ্ড বেয়ে বালিশ বিছানায় মেখে গেল। মহারাজ ব্যস্ত হয়ে শুশ্রূষায় লেগে গেলেন। পূর্ণানন্দ ধীরে ধীরে বলল—"নিষ্কাম গেরুয়ার সাথে সাথে রক্তরাগেও রঞ্জিত হয়েছে সিড়ি।"

সমাপ্ত

শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের কথাচিত্র

'নমামি'

সম্বন্ধে আশীর্বাণী, অভিমত ও সমালোচনা।

বিপ্লবীনায়ক শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

(মহারাজ, নমামির খালাছরণ)

"আমাদেব দেশে যে সব নভেল, নাটক, গল্প লিখিত হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি গঠনেব সহায়ক হয না। আধুনিক লেখকগণের বিপ্লবযুগ সম্বন্ধে কোন ধাবণা না থাকায় বিপ্লবদলেব কর্ম্মীগণের চবিত্র লইযা ক্যারিকেচাব কবে। বর্ত্তমান দুর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন ও কাপুরুষতার যুগে তোমার 'নমামি' সময়োপযোগী ও সুন্দব হইয়াছে। ইহা পাঠ কবিযা এ যুগেব তরুণগণ বিপ্লবধুগেব তরুণদের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে।

বিপ্লবযুগের ধীমান্ নায়ক ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ঃ-

স্নেহের ভাই জিতেশ! তুমি আমাব অন্তবেব শত শত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কব। তুমি চবিত্র চিত্রনে যে এমন সিদ্ধহস্ত তাব পরিচয় আগে পাই নি। তোমাব 'নমামি'ব চরিত্রগুলি (অনেকেব সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পবিচয ছিল) প্রাণবন্ত, সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাভাবিক ও বৈপ্লবিক প্রকৃতিব। তোমার বাচনভঙ্গী, শক্তিশালী লিপিকা, ভাষাব সাবলীলতা ও মাধুর্য এবং সর্বোপরি নাটকীয় চিত্তাকর্ষক ঘটনার পব ঘটনা সম্পাত সুনিবদ্ধভাবে, বইখানিকে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য কথা-চিত্র কবেছে। বইখানি হাতে পেলে না শেষ করে পাবা যায না। আলবৎ "খালীছরণ" এঁকেছ— অতুলনীয়। আমাদেব মহাবাজকে আঁকতে গিয়ে তুমিও সাহিত্যিক মহাবাজ হযে গেছ।

পূর্ব পাকিস্থানের মন্ত্রী ডাঃ মালেক ঃ— নমামি পডলাম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। যাঁরা হাসিমুখে ফাঁসিতে গিয়েছেন দেশকে স্বাধীন

করতে তাঁদের আত্মা আজকের এই স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট কি না জানিনে। তবে এই টুকুই আশা জগতে কোন দানই বিফলে যায় না। তাঁদের এই আত্মাহুতি একদিন আমাদের সুপ্ত জাতিকে সত্যিই সত্যিকারের স্বাধীনতা এনে দেবে। আমরা হয়ত কেউই তখন বেঁচে থাকব না। ইতিহাস শুধু যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দেবে এরা ছিল 'রক্তবীজে'র বীজ।

বিপ্লবনায়ক শ্রীকেদার সেন গুপ্ত—"নমামির" ধরণ ধারণ লেখার ভঙ্গী সুন্দর হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে নূতনতর ধারা সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে সেখানে 'নমামি' উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই।

ছায়াচিত্রাভিনেতা ও ডিরেক্টর শ্রীকুমার—মরমী লেখকের দরদমাখানো স্পর্শ পেয়ে দেশের পরম গৌরবোজ্জ্বল অথচ বহুলাংশে সাধারণের অজ্ঞাত অধ্যায়ের এক নিপুণ আলেখ্য মধুর রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রুগ্ন-কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব এবং মলিন প্রতিকৃতি অধ্যুষিত বর্তমান বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে কঠোর অথচ সুমহান বাস্তবের এমনি এক সুমধুর আলেখ্যের আবির্ভাব পরম সমাদরেই গ্রহণ করেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বিপ্লবনায়ক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ—জিতেশচন্দ্রের 'নমামি' বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। বাস্তবচরিত্রের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ ও এমন নিখুঁত রূপদান ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই।"

Amrita Bazar Patrika..............Sj. Jitesh Chandra Lahiri deserves our gratitude for telling in simple and elegant style the stories of our heroes who preferred death to thraldom. We warmly commend the volume to our readers.

আনন্দবাজার পত্রিকা—"সুন্দর পচ্ছদপট। অগ্নিযুগের ঘটনা ও ঘটনাবহুল চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থের গল্পগুলি লিখিত

হইয়াছে।…………বাস্তব যে কল্পনাকেও হার মানায় নমামি'র গল্পগুলির ঘটনা ও উহার চরিত্র চিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লেখক স্বয়ং বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবদলের মানুষ-গুলিকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কাহিনী সে কারণে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের ইতিহাসধর্ম্মী গল্প ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। প্রতিটী গল্প যেন ছবির পর্দায় অভিনীত হইয়া চলিয়াছে। লেখকের ভাষা ও বলিবার ভঙ্গী এক কথায় চমৎকার।

দেশ—……………বাস্তব ঘটনাকে রসরাজ্যের ভাবনার মধ্যে লইয়াই ইতিহাসকে প্রাণময় বিকাশে রূপায়িত করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থকারের আছে। পুস্তকখানাতে অগ্নিযুগের ঘটনা অবলম্বন করিয়া নয়টি গল্প লিখিত হইয়াছে। ছোট গল্পের রসধর্মে ঐগুলি সমুত্তীর্ণ হইয়াছে। ভাষা সুষ্ঠু, সংযত গতিতে সংবেদনের মুখ্য ধারায় মনকে নাড়া দেয়,—ঘটনার গণ্ডী হইতে তাহাকে মানবতার মহত্তর আদর্শের বেদনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। বিপ্লবী আন্দোলনের রোমাঞ্চকর পরিপ্রেক্ষায় মনোধর্মের এই সত্য সমীক্ষা গল্পগুলি সার্থক করিয়াছে। গ্রন্থকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সে আন্দোলনের প্রাণতত্ত্বকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'নমামি' 'চপল-রুদ্র' 'অজর-অমর' 'সিঁড়ি' গল্প কয়েকটি সাহিত্যে স্থায়ী হইবার যোগ্য। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

প্রবাসী—……….."এই পুস্তিকায় বাংলার বিপ্লবী ও সন্ত্রাস-বাদী যুগের এমন কয়েকটী চিত্র আঁকা হয়েছে যাহা ঐ যুগের মাহাত্ম্যকে আমাদের চোখের সামনে নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গল্পচ্ছলে কয়েকজন বিপ্লবী-প্রধানের কার্যকলাপ বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহাদের প্রচেষ্টা ও সময়কে পাঠকবর্গের নিকট জীবন্ত করিয়াছেন। আমরা সে যুগের বিপ্লবীদের মনোভাবের যে পরিচয় পাই বলার কৌশলে তাহা যে কোন দেশের

পক্ষে শ্লাঘনীয়।.........আশা করি লেখকের ভাণ্ডার শূন্য হয় নাই; আমরা তাহা হইতে আরও দানের অপেক্ষায় থাকব।

আজাদ—········ নমামির ঘটনা সংস্থান এমন ভাবে করা হইয়াছে যে কৌতুহলোদ্দীপক গল্পের মাধুর্য প্রতিটী বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। ভাষার উপর দখল এবং রস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লেখকের আছে। ফলে নমামি পড়তে প্রথম শ্রেণীর গল্পের রসাস্বাদ করা যায়। লেখকের বর্ণনায় একটা আন্তরিকতা ও দরদের স্পর্শ আছে। ··········যারা বিরুদ্ধভাব নিয়ে পড়বেন তাঁরাও সবল সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে একে সমাদর না করে পারবেন না। প্রথম গল্প নমামি পাঠকবর্গকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করবে। নমামি উপন্যাসের মত সরস হয়েছে

Nation :— ....Recollections of Mr. Lahiri have helped to re-lit the almost darkened period in Bengal's early political history. which was essentially vigorous and brave.

বর্ত্তমান—...........এই পুস্তিকার মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি আছে তার ছবি সব গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু আছেই। বই-খানির সব চেয়ে বড় কথা, তার নামকরণ এবং সেই নামের সার্থক চরিত্র অঙ্কন। ··········মণি তিমির গহ্বরেই থাকে,— আভা তার আপনিই প্রকাশ হয়। লেখক সেই মণি চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন, সেইটুকুই দেশের পরম সম্পদ ও চরম লাভ।

ইত্তেহাদ—···অগ্নিযুগের বিবরণী পূর্ণ ইতিহাস না লিখে জিতেশ বাবু গল্পকারে বইটি রচনা করেছেন বলে সব শ্রেণীর পাঠকের কাছে বইখানি আদরণীয় হইবে। সমস্যাপীড়িত দরিদ্র দেশে কোন নীরস বক্তব্যের এমনি রূপায়ণ রসাস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টির সহায়তা করে, সেই সঙ্গে লেখকের রচনা কলারও প্রমাণ দেয়।······বক্ষ্যমাণ চরিত্রগুলি বিস্মৃতির পথ হতে এসে সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের দাবী রেখে যাবে পাঠকের মনে।

পূর্ব পাকিস্থানেব মন্ত্রী জনাব হবিবুল্লা বাহার :—শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত 'নমামি' পড়লাম। তিলে তিলে জীবন দিয়ে দেশেব স্বাধীনতাব আবহাওযা যাঁবা তৈবী কবেছেন—নিজেদেব অস্থি দিয়ে যাঁবা দিকে দিকে জ্বেলেছেন মুক্তিব আগুন—বাংলাব সেই বিপ্লবী বীবদেব হাসি কান্নাব কাহিনী নিয়ে লেখা এই বইখানি। লেখক নিজে বিপ্লবী—এই জন্যে বিপ্লবী আন্দোলনেব কথা-চিত্র তাঁব হাতে ফুটেছে চমৎকাবভাবে। পড়তে পড়তে বিপ্লবী-বাংলাব ইতিহাস ছায়া-ছবিব মত পাঠকেব চোখেব সামনে ভেসে উঠে। ……ঘটনাগুলো আপনাব মাহাত্ম্যে ও বর্ণনার কৌশলে চোখে লাগে বিদ্যুৎ চমকের মত। কালেব কৌটায নিজ গুণেই এগুলো অক্ষয হোযে থাকবে।

সোনাব বাংলা……'নমামিব' গল্পগুলি ঠিক যতখানি রোমাঞ্চকব, ততখানি বাস্তব ঘটনাব উপবেই পবিবেশিত। 'নমামি' 'বন্ধু' 'ষ্টাব' 'স্কলার', 'ফিলসফাব'—এবা বজ্রগর্ভ মেঘেব পূর্বাভাস—বিদ্যুতেব ঝিলিক—নিবহঙ্কাব পণ্ডিত এবং দার্শনিক। 'নমামি' 'বন্ধু' 'অজব-অমব' 'সংঘাত' গল্পগুলি সে যুগেব প্রতীক হিসাবে ধবা যেতে পাবে……নমামি বিপ্লবীযুগেব ইতিহাস আলোচনাব নূতন পথ দেখিযেছে।

শ্রীঅশোক মিত্র আই, সি, এস—মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া 'নমামি' পড়িলাম। অগ্নিযুগেব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমষ্টি বর্ণনাব গুণে জীবন্ত ও রোমাঞ্চকব হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের বলিষ্ঠ লেখনী হইতে আরও দানের অপেক্ষায় বহিলাম।

বাস্তব ঘটনাকে রসরাজ্যের ভাবনার মধ্যে লইয়াই ইতিহাসকে প্রাণময় বিকাশে রূপায়িত করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থকারের আছে। ভাষা সুষ্ঠু, সংযত গতিতে সংবেদনের মুখ্য ধারায় মনকে নাড়া দেয় —ঘটনার গণ্ডী হইতে তাহাকে মানবতার বৃহত্তর আদর্শের বেদনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। বিপ্লবী আন্দোলনের রোমাঞ্চকর পরিপ্রেক্ষায় মনোধর্ম্মের এই সত্য-সমীক্ষা গল্পগুলি সার্থক করিয়াছে—"দেশ"

—০:*:০—

···'নমামি পড়তে পড়তে বিপ্লবী বাংলার ইতিহাস ছায়াছবির মত পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ঘটনাগুলো আপনার মাহাত্ম্যে ও বর্ণনার কৌশলে চোখে লাগে বিদ্যুৎ চমকের মত। কালের কোঠায় নিজগুণেই এগুলো অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জনাব হবিবুল্লাহ বাহার

(পূর্ব-পাকিস্থানের মন্ত্রী)